ধর্ম নিয়ে দু'চার কথা

শিবপ্রসাদ রায়

ধর্ম নিয়ে দু'চার কথা

শিবপ্রসাদ রায়

প্রাপ্তিস্থান

১২ সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা-৭৩

প্রকাশক ঃ
তপন কুমার ঘোষ
৫, ভুবন ধর লেন
কলকাতা-৭০০০১২

প্রথম প্রকাশ ঃ মহালয়া, ১৪১৫
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ ১লা বৈশাখ, ১৪২১

মুদ্রণ ঃ
মহামায়া প্রেস এণ্ড বাইন্ডিং
৩০/৬/১, মদন মিত্র লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

দাম ঃ ৬.০০ টাকা

ধর্ম নিয়ে দু'চার কথা

ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ। এই দেশ জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসনে সমাসীন ছিল ধর্মীয় গুরুত্বে। এদেশের যেসব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ধর্মকে শোষণের হাতিয়ার মনে করেন, তাঁরাও স্ট্রাইকের প্রতিশব্দ ব্যবহার করেন ধর্মঘট। অবরোধের প্রতিশব্দ সত্যাগ্রহ। **সত্য ধর্ম ব্যতীত এই দেশ চলতে পারে না**। রূপকথার গল্পে যেমন এক একটা দৈত্যের প্রাণ থাকতো এক একটা খাঁচার পাখীর মধ্যে। **ভারতের প্রাণভোমরা হচ্ছে ধর্ম**। এই ধর্মবুদ্ধি থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যেদিন থেকে এদেশ বস্তুবাদী হবার, ধর্মনিরপেক্ষ হবার চেষ্টা করেছে এদেশের সর্বনাশের শুরু সেদিন থেকেই। ধর্মহীন ব্যক্তি পশুর সমান। জড়বাদী, বস্তুবাদীর শেষ কথা ভোগ চরম ভোগ। আর কে না জানে ভোগের শেষ নেই। ভোগের চরম মানেই দুর্ভোগ। ধনাঢ্য আমেরিকা, তৈলসমৃদ্ধ আরবের ভোগস্পৃহা, যৌন বিকৃতি, অপরাধ প্রবণতা এ সবের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। সম্প্রতি প্রাভদায় প্রকাশিত খবরে প্রকাশ, কম্যুনিস্ট রাশিয়ায় কিশোর-কিশোরীদের প্রচণ্ড যৌন উন্মাদনা দেখা দিয়েছিল। দেবেই। কারণ ওইসব দেশে কোথাও ধর্ম নেই, কোথাও ধর্মকে একটা অনুষ্ঠান মাত্র মনে করা হয়। বার্ণার্ডশ অনেকদিন আগে লিখেছিলেন ঃ ইউরোপ **খ্রীষ্টধর্মকে গ্রহণ করেছে অবলম্বন করেনি**। তাই যত উৎসাহ নিয়ে রবিরার সকালে তারা গীর্জায় যায়, তার চেয়ে বেশী উৎসাহ নিয়ে সন্ধ্যায় চলে যায় তাড়িখানায়। অনেক আধুনিক পণ্ডিত আবার গোলমাল করে ফেলেন ইংরাজী রিলিজিয়ান এবং ধর্ম শব্দের মধ্যে। **রিলিজিয়ান আর ধর্ম কিন্তু এক নয়**। একটা উপাসনা পদ্ধতি, **অন্যটা হচ্ছে 'ওয়ে অফ লাইফ'—জীবন পদ্ধতি**। যে জীবন পদ্ধতি মানুষকে ধীরে ধীরে মনুষ্যত্বে উদ্বোধিত করে দেবত্বের দিকে ধাবিত করে। আরো পরে ঈশ্বরে উপনীত হওয়া বা যে বস্তু নিজের মধ্যে উপলব্ধি করা।

তখন সে অল্পে সন্তুষ্ট হয় না। নাল্পে সুখমস্তি। ভূমায় সুখ খোঁজে। অনন্তের স্বাদ পেতে চায়। মাছির মতো ভোগের ঘা খুঁটে খেতে আর তার প্রবৃত্তি থাকে না। মৌমাছির মতো অমৃত সুধাতেই তার শুধু তৃপ্তি। তাই এদেশে অতি সহজে উচ্চারিত হয় ঃ **মাতৃবৎ পরদারেষু, পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ। একমাত্র এই দেশেই স্ত্রী ছাড়া সব নারীকেই মাতৃতুল্য মনে করা হয়। অন্যান্য দেশে মা ছাড়া সব নারীই ভোগ্যপণ্য**। ধর্ম সবদেশেই কোন না কোন ভঙ্গীতে আছে। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য, সংযম প্রবৃত্তির উপর লাগাম

টানার নির্দেশ আছে শুধু ভারতেই। **ইসলামে ব্রহ্মচর্য্য, সংযমের কোন বালাই নেই।** খ্রীষ্টধর্মে ব্রহ্মচর্য্যের কথা থাকলেও তা অনুসরণের কোন পদ্ধতি বলা হয়নি। প্রবৃত্তিপরায়ণ একটা মানুষ যতো ধমাচরণই করুন তাঁকে এদেশে কেউ ধার্মিক বলে মনে করে না, ভণ্ড বলে ঘৃণা করে। বেদনার হলেও সত্য এই পুণ্য ভারতভূমিতে **এখন ধর্মের নামে ভণ্ডামিই চলছে বেশী।** আচরণ সর্বস্ব ধর্ম অন্তরে কোন স্বর্গীয় আলো জ্বেলে দিতে পারছে না। আড়ম্বরে চীৎকারে তার সব শক্তি ব্যয়িত হয়ে যাচ্ছে। **অহোরাত্র ধর্মাচরণ করা ব্যক্তিকে একটু টোকা মারলেই দেখা যাচ্ছে প্রবৃত্তির দগদগে ঘা তার সর্বাঙ্গে।**

ধর্মকে যাঁরা একটা অপ্রয়োজনীয় বস্তু মনে করেন তাঁরা এঁদের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে বলেন, এইতো **ধর্মাচরণের পরিণতি। তাই ধর্মচর্চাশীল ব্যক্তিদের উচিত সর্বাগ্রে নিজেদের দিকে তাকানো।** প্রত্যহ নিগূঢ় আত্মসমীক্ষা। অস্থিরতা থেকে স্থিরতায় গিয়ে নিজের মুখোমুখি দাঁড়ানো। ফাঁকিটা তখন চোখে পড়বে। নিত্য সমীক্ষায় দূর হবে স্ববিরোধিতাগুলো। জপ-কীর্তন সেই সঙ্গে মিথ্যাচারণ দূর হবে। রাস্তায় আপামর সকলকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে আড়ালে নির্দয় নৃশংসতা থাকবে না। প্রবঞ্চনাময় কৃত্রিম একটা জীবন সারাদিন বোঝার মতো টেনে বেড়াবার কষ্ট ভোগ করতে হবে না। নির্মলতা, সরলতা, পবিত্রতা মাখানো মনে এবং মুখে এক একটি পূর্ণ মানুষ বেরিয়ে আসবে একটা ভাঙ্গাচোরা মানুষের মধ্যে থেকে। তবে সার্থক হবে এদেশে ঈশ্বরের বারংবার জন্মগ্রহণ করা। লক্ষ মহাপুরুষের পদরজ ধারণ করা। এখন **ধর্মের নামে এদেশে বেশীরভাগ অংশটাই চলছে ভস্মে ঘৃত সমর্পণ। তাই যথার্থ ধার্মিক মানুষ যেন এক বিরল প্রজাতি।**

ধর্ম নিয়ে কিছু কথা বলার আগে একটা গল্প বলে নিই। একজন যুবক এখানে ওখানে গান গাইতো। গলাটা ভালো ছিল, তালজ্ঞান ছিল মোটামুটি, লোকে ভালই বলতো। একজন লোক তাকে পরামর্শ দিল, তুই তো গান ভালই গাস, তাহলে একটা ওস্তাদের কাছে কিছু তালিম নিয়ে নিচ্ছিস না কেন? গানের ব্যাকরণটা শেখা থাকলে তোর গান আরো ভালো হবে। যুবকের মনে ধরল কথাটা। একজন ওস্তাদকে গিয়ে বলল সব। তারপর জিগ্যেস করলো, আচ্ছা ওস্তাদজী, মোটামুটি এইসব শিখতে কতদিন লাগবে? ওস্তাদজী বললেন ঃ তুমিতো জানই কিছু কিছু, কাল এসো তোমার গান শুনবো, তারপর বলে দেবো কতদিন লাগবে। যুবক নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেল।

পরদিন ছেলেটির গান শুনে ওস্তাদ বললেন ঃ দ্যাখো বাবা, আমার কাছে শিখতে লাগে তিন বছর। তবে তোমার লাগবে আট বছর। তুমি নিজে নিজে যা ভুল শিখে বসে আছো, সেগুলো ভোলাতেই আমার পাঁচ বছর লাগবে, তারপর শেখানো। **এদেশে প্রত্যেকটি ব্যক্তি ধর্মকে নিজের নিজের মতো বুঝে ধর্মাচরণ করে থাকেন, ধর্মের ব্যাখ্যা করে থাকেন।** কেউ বলেন ধর্ম বিরাট জিনিষ, এক জন্মে কিছুই বোঝা যায় না। কারো বক্তব্য ধর্মের গূহ্যতত্ত্ব গুহায় নিহিত। তা উদ্ধার করা কি চাট্টিখানি কথা। এইসব কথা যাঁরা বলেন তাঁরা যে সবাই অজ্ঞ তা ঠিক নয়। তবে ওই ভুল গান শেখা লোক। এইরকম **নিজে নিজে মনগড়া ধর্মের কারণে একটা কংক্রিট এবং সার্বজনীন ধর্মের ধারণা এদেশে গড়ে ওঠেনি। তার ফলে দেশটা ধর্মের হয়েও চারিদিকে এত অধর্ম। চিন্তার জগতে এতো বৈষম্য।**

ধর্ম মানে জীবনকে, জগৎকে যা ধারণ করতে পারে; শুধু ধারণ নয় রক্ষা করতে পারে। এইখানেই শেষ নয় তাকে উর্দ্ধমুখী করতে পারে, তাই ধর্ম। ধর্ম মানে স্বভাবও। জগতে প্রত্যেকটি জীব এবং বস্তুর এই ধর্ম বা স্বভাব আছে। খুব স্থূল উদাহরণ দেওয়া যাক দুটো—জল আর আগুন। জলের স্বভাব শৈত্য, প্রবহমানতা, আগুনের পাবকতা, উত্তাপ। জল যেমন জলের দিকে এগিয়ে যায় আগুন এগিয়ে যায় আগুনের দিকে। এটাই তার স্বভাব ধর্ম। তেমনি মানুষের একটা ধর্ম আছে। সেটা হচ্ছে সে যেখান থেকে এসেছিল আবার সেইখানেই ফিরে যাওয়া। হিন্দুত্বের দেওয়া ধারণা মানুষ ঈশ্বর থেকে এসেছে সুতরাং ঈশ্বরেই আবার তাকে মিলিত হতে হবে। এর জন্য যা কিছু পরিশ্রম, প্রচেষ্টা, অনুসন্ধান তাই ধর্ম। এর বাইরে যা কিছু তা তূষে পাড় দেওয়া মাত্র।

ধর্মাচরণকারীর প্রথম কাজ প্রবৃত্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ। প্রবৃত্তি বড়ই শক্তিশালী। আর তা মানুষকে ক্রমাগত নীচে নামায়। প্রবৃত্তি সমূহ পরস্পারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত। একটা ঘটনা দিয়ে বিষয়টা স্পষ্ট করা যাক। প্রথম রিপুকে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে এইরকম এক ব্যক্তি খাবারের দোকানে বড় সাইজের রসগোল্লা দেখে লুব্ধ হলো। পকেটে পয়সা নেই, ভাবছে। এমন সময় একজন এসে সব রসগোল্লাগুলোই কিনে নিয়ে গেল। লোকটা ছিল লুব্ধ, হলো ঈর্যান্বিত, তা থেকে ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ। ক্রোধ মানুষের শরীরে উত্তেজনা ছড়ায়। রক্ত থেকে বীর্য্যকে বিচ্ছিন্ন করে। ক্রোধী মানুষেরা কামপরায়ণ হবেই। সুতরাং যে ধর্মে প্রবৃত্তি শাসন নেই, অধিকার ভেদে খাদ্যাখাদ্য বিচার নেই, নিবৃত্তিমার্গের নিরন্তর চর্চা নেই—তা ধর্ম নয়। আমাদের বুকের মধ্যে সাজানো আছে

প্রবৃত্তির চক্রব্যূহ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য। তেমনি সজ্জিত আছে নিবৃত্তির নিশ্চিত নির্গমন পথ—স্নেহ, ভালবাসা, ক্ষমা, শ্রদ্ধা, ভক্তি। তাই ধার্মিক ব্যক্তির প্রথম লক্ষণ স্নিগ্ধতা। এটা হচ্ছে ধার্মিক ব্যক্তি মাপবার থার্মোমিটার। যিনি ধর্মাচরণ করেন অথচ স্নিগ্ধ নন, তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য না করে সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে, তিনি মালা পরুন বা পৈতে, তিনি এখন ঘুরে বেড়াচ্ছেন প্রবৃত্তিমার্গে। তিনি রুক্ষ হবেন। কথাবার্তায় তৈরী করবেন বিরোধ। নিম্নস্বরে কথাই বলতে পারবেন না। সকলের সম্পর্কে কটু মন্তব্য করবেন। তাঁর কেবলই মনে হবে, কোথাও মনের মতো কাজ হচ্ছে না, সবাই তাঁর বিরুদ্ধে।

তাঁর উগ্র অশান্ত হৃদয় চতুর্দিকে দেখবে অসংগতি। রাজনীতির মধ্যে থাকলে দলাদলি করবে, কোনো গুরুর শিষ্য হলে গুরুভাইদের সঙ্গে ঝগড়া করবে। ধর্মীয় সংস্থার মধ্যে ঘুটিং করবে। এইসব করাকে সে মনে করবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করছি। এরা নিজেদের মধ্যে যতোটা তার চেয়ে বাইরে বেশী। নিবৃত্তি মার্গের মানুষ পূর্ণকুম্ভের মতো। শব্দ কম। কাছে গেলেই মনে হবে শান্ত হয়ে গেলাম। প্রবৃত্তি তাড়িত মানুষের কাছে গেলেই সে আপনাকে কুপিত করে তুলবে। সহস্র সমস্যার কথা তুলবে এবং তা শুধু নিজের। তারমধ্যে সন্তুষ্টি বলে কিছু থাকবে না।

এরা ধার্মিক নয়, ধর্মাচরণকারীও নয়। প্রকৃত ভক্ত কিংবা ধার্মিকদের এদের সম্পর্কে সতর্ক থাকা উচিত। এই পৃথিবীর বস্তু জগতে একটা অসংগতি সংঘর্ষ আছেই। শরীরটা যেহেতু বস্তু থেকে এসেছে, চারপাশের প্রকৃতি আমাদের প্রভাবিত করছে এর সবটাই ঠিক। কিন্তু আমি যে চৈতন্যময় সত্তা—তাকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা প্রকৃতির নেই। এই চৈতন্যের জাগরণই ধর্মের কাজ। চারপাশের সাজানো মোহ, মায়া নিজের শরীরি প্রবৃত্তির আকর্ষণ আমাদের প্রকৃত পরিচয়কে গোপন করে ফেলে। ধর্ম সেই পর্দাগুলো চোখের সামনে থেকে সরিয়ে দেয়। যার দেয় না সে সমস্ত শক্তি নিয়ে মেতে থাকে বাজে কাজে। কি হাস্যকর ট্রাজেডি। আমরা নির্বাচন এলে কতভাবে চিন্তা করি কাকে নির্বাচিত করা যায়। স্ত্রী নির্বাচনেও কত দেখাদেখি। বাজারে গিয়ে প্রতিটি বস্তু যাচাই করি। জগতের সব বিষয়েই মনে করি আমার একটা নিজস্ব মত আছে। কিন্তু পৃথিবীতে মানব জীবনে সবচেয়ে যে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তাতে আমাদের কোন হাতই নেই মতামতের কোন দাম নেই। এ জগতের কোন শক্তিই তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

মানুষের পৃথিবীতে আসা। এটা আমাদের মতামত যাচাই করে কেউ পাঠায়নি। কেউ জিগ্যেস করেনি এই দুঃখ, এই সুখ, এই আনন্দ, বেদনা তোমাকে দেওয়া হবে,

তুমি যাবে কি পৃথিবীতে? যখন চলে যাবে তখনো কেউ শুনবে না আমাদের আবেদন। প্রচণ্ড ব্যস্ততা রয়েছে কিছু বলে কিছু সময় চাইলে দেবে না কেউ। এই আসা এবং যাওয়াটা যার হাতে তাকে অনুসন্ধানের চেষ্টা আমাদের নেই। ধর্মাচরণকারী মানুষের অনুসন্ধিৎসা থাকবে এইদিকে। এই সন্ধানকে একনিষ্ঠ করার জন্যই চিত্তের প্রশান্তি। প্রবৃত্তির ওপর থাকা চাই অঙ্কুশ।

ধর্ম নিয়ে জল ঘোলা হচ্ছে, নাকি সমুদ্র মন্থন? সে কথা পরে। তবে আমি বলতে পারি, বিষ উঠলেও আমার উদ্দেশ্য কিন্তু অমৃতের সন্ধান। শৃণ্বন্তু বিশ্বে আমরা অমৃতের পুত্র হয়েও এতো বিষাক্ত কি করে হয়ে গেলাম তার কথঞ্চিৎ আত্মানুসন্ধানও কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। ধর্মের আচরণের মধ্য দিয়ে আমরা সত্যকে লাভ করি। সত্য সার্বজনীন, তা নিয়ে বিতর্ক থাকবে কেন? অথচ বিতর্ক আছে। দুই আর দুইয়ে চার এটা অঙ্কের সত্য মাত্র, মায়াময় জগতের সত্য, তথাপি এ নিয়ে কারো সন্দেহ নেই, দ্বিধা নেই। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মিশ্রণে জল হয়। এটি প্রপঞ্চময় জগতের সত্য, এ নিয়েও কারো দ্বিমত নেই, বিতর্ক নেই। তাহলে এর চেয়ে কঠিন সত্য, চরম সত্য নিয়ে এতো বিরোধ কেন? মতদ্বৈধতা কেন? এত বিভেদ কেন? তাহলে ধর্মের নামে যেসব জিনিষ বাজারে চালু রয়েছে তার অনেকগুলিই ধর্ম নয়। ধর্মের আবরণে অধর্ম নিশ্চয়ই। আগুন যে পাত্রেই বহন করা যাক তার দাহ্যতা অনুভূত হবেই। কারণ দাহিকা শক্তিই আগুনের ধর্ম। ধর্মেরও কতকগুলো লক্ষণ আছে। মূলতঃ দশটি। ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ। তার সরল বাংলা হচ্ছে, ধৈর্য্যশীল হওয়া, দয়া প্রদর্শন করা, মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখা, চুরি না করা, পবিত্র থাকা, প্রবৃত্তিকে শাসনে রাখা, মেধার অধিকারী হওয়া। জ্ঞানী হওয়া, সত্যকে আঁকড়ে ধরে থাকা, কোনো কারণেই ক্রুদ্ধ না হওয়া। এই দশটি লক্ষণ ধার্মিকের মধ্যে ফুটে উঠতে হবে। সে যে কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের হতে পারে। এইসব লক্ষণের অধিকারী হলেই সে ধার্মিক। তাছাড়াও প্রাথমিক কিছু লক্ষণ আছে। ধর্মের প্রথম লক্ষণ সহিষ্ণুতা, ধর্মাচরণকারীর প্রথম লক্ষণ স্নিগ্ধতা। ধার্মিক মানুষের থাকবে পরমত শ্রদ্ধা, সারল্য, তেজ, সাহসিকতা এবং সর্বকর্মে ভারসাম্য।

প্রাণায়াম করুন, ইড়া, পিঙ্গলায় ভারসাম্য এনে সুষুম্নার পথ সুগম করতে হবে। গীতা পড়ুন, ক্লীবতা ত্যাগের কথা তো সর্বাগ্রেই আছে, তারপরেই আছে ভারসাম্যের কথা। সুখে দুঃখে শীতে, গ্রীষ্মে, নিন্দায়, স্তুতিতে সমান হতে বলা হয়েছে। এই মাপকাঠি বা থার্মোমিটারে ধর্মের জ্বর মাপতে গেলেই দেখা যাবে, অনেকেরই জ্বর

কৃত্রিম। বগলে রসুন দিয়ে যে কায়দায় ছাত্রেরা ছুটি দিতে বাধ্য করতো শিক্ষকদের। এই প্রবঞ্চনাই এখন সর্বত্র সতত দৃশ্যমান।

এখন যিনি যতো বেশী ধর্ম কর্ম করেন তিনি ততো ভীরু। ঈশ্বরের চেয়ে অনেক বেশী তাঁর বিশ্বাস ব্যাঙ্ক এবং পুলিশকে। মালাধারী, দাড়িওয়ালা এবং টিকিধারী মানুষকে প্রত্যেকটি আদালতের আঙিনায় দেখা যায় ঘোরাফেরা করতে। মিথ্যা সাক্ষী দেন, উকিলের শেখানো ভিত্তিহীন কথা গীতা স্পর্শ করে গড়গড়িয়ে বলে যান। রাত্রে কোর্ট থেকে ফিরে এঁরা জপ করেন, কীর্তন করেন। আশ্চর্যের কথা নিজেদের ধার্মিক বলেও মনে করেন। রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন মন-মুখ এক কর, অর্থাৎ সারল্য। সে বস্তু ইদানীংকালের ধার্মিক ব্যক্তিদের মধ্যে দেখাই যায় না। একটি শব্দ এদেশে বেশ প্রচলিত, ধর্মভীরু। এই শব্দটি আপত্তিকর।। ধর্ম কি মানুষকে ভীরু করে? ধার্মিক মানুষই তো হবে সাহসী মানুষ, তেজস্বী মানুষ। তিনি এই পৃথিবীর নশ্বরতা জানেন, জানেন আত্মার অমরত্ব। তাঁর তো ভগবানকেও ভয় নিষ্প্রয়োজন। তিনি তো স্বচ্ছন্দে ভগবান বুকে পদচিহ্ন এঁকে দিতে পারেন। ভগবান সযত্নে তা রক্ষাও করেন। অনেকে মনে করেন সৎলোকেরা দুর্বল হয়, শান্তিপ্রিয় হয়। এই কথায় আমার ঘোরতর আপত্তি। প্রকৃত সৎলোকেরা কখনো ভীরু হয় না, দুর্বল হয় না। আসলে এদের খারাপ হবার মতো হিম্মত নেই, সাহস নেই তাই ভয়ে ভয়ে এরা ভদ্র সেজে থাকে। ভদ্রতার আড়ালে তাদের এক অন্য জীবন, জঘন্য জীবন। ধর্ম যদি তেজী, বলিষ্ঠ, বীর্য্যবান, সাহসী অন্যায়ের প্রতিবাদকারী মানুষই তৈরী করতে না পারে, সে ধর্মকে আমি ধর্ম বলে মানতে রাজী নই।

এখানে একটা নৈয়ায়িকের প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। পাত্রাধার তৈল না তৈলাধার পাত্র? ধপাস্ করে পড়ে না পড়ে ধপাস্ করে? জেলে গিয়ে নেতা হয়, না নেতা হয়ে জেলে যায়। ঠিক তেমনি ধর্ম মানুষকে বিকৃত করেছে না মানুষ ধর্মকে বিকৃত করেছে।

আমরা ধারণা মানুষই ধর্মকে বিকৃত করেছে। আর আমাদের পূর্বসূরীরা ধর্মের একটি দেশব্যাপী সার্বজনীন রূপকে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন। সবকিছুকে মেনে নিয়ে 'যতো মত তত পথ' ঘোষণা করে এক অদ্ভুত জটিলতার সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেকে নিজ নিজ মান এবং গুণ অনুযায়ী ধর্মের ব্যাখ্যা এবং আচরণ করছে, ফলে আমরা কোন পথ দিয়েই একটি সর্বকালীন সর্বজনগ্রাহ্য সত্যকে স্পর্শ করতে পারছি না। আমার আলোচনা সনাতন হিন্দুধর্ম নিয়ে। এছাড়া পৃথিবীতে কোন সত্যধর্ম শাশ্বত ধর্ম আছে, তথ্যে, প্রমাণে, ইতিহাসে তা বলে না। ধর্ম সম্পর্কে মোটেই পড়াশুনা না

করা ব্যক্তিরা অন্যান্য দু'একটি মতবাদকে ভ্রমবশতঃ ধর্ম বলে থাকেন। কিন্তু তা নিতান্তই ব্যক্তির মস্তিষ্কপ্রসূত। তাই তা মতবাদ মাত্র। হজরত মহম্মদ এবং যীশুখ্রীষ্ট না জন্মালে এই মতবাদেরও জন্ম হতো না। আর কে না জানেন জগতে যার জন্ম হয় তারই মৃত্যু আছে। অতএব এগুলি স্বতঃস্ফূর্ত নয় এবং শাশ্বত নয় অর্থাৎ ধর্ম নয়। এগুলি প্রচারের নৃশংসতা, রুক্ষতা, উগ্রতা, পরধর্মবিদ্বেষ প্রমাণ করে শাশ্বত ধর্মের সংজ্ঞায় এগুলো পড়ে না। বর্তমানেও পৃথিবী জুড়ে এরা অশান্ত।

ধর্ম এক, অখণ্ড, অবিভাজ্য। আকাশ, বাতাস যেমন অনেক অধিক হয় না, ধর্মও তাই। ধর্ম এক অখণ্ড অনন্ত। চিরন্তন সনাতন। এই সনাতন ধর্মের সার্বজনীনতা হারানোর পিছনে একটা ঘটনা বলছি। পূর্বসূরীদের কিঞ্চিৎ ব্যর্থতা। সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলে তো এক হাজার বছরের নিরন্তর আঘাতে আমাদের অস্তিত্বই থাকতো না। সনাতন শব্দটাই একটা অসত্য অমর্যাদাকর বিশেষণ রূপে চিহ্নিত হতো। দ্বিতীয় ঘটনা অধিকারভেদে সাধনার ধারা আমাদের ধর্মকে যেমন বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতায় অধিষ্ঠিত করেছে তেমনি বৈচিত্র্যে, বর্ণাঢ্য করতে দিয়ে কালে পার্থক্য ও দূরত্বও সৃষ্টি করে ফেলেছে। অনন্তকালের ধারায় আমাদের ধর্মে এটা প্রক্ষিপ্ত ও সাময়িক তাও জানি। একটি স্কুলে একটিমাত্র শ্রেণী, শ্রেণীহীন সমাজেও নেই। হীনশ্রেণীর সমাজে তা থাকলেও থাকতে পারে। পাত্র ভেদ, আধার ভেদ, খাদ্য বিচার ছাড়া ধর্ম হয় এ ভাবতে আমরা অভ্যস্ত নই, ইতিহাসে কোন প্রমাণও নেই।

তৃতীয় ঘটনা, বর্তমানকালে গুণ এবং মান দেখে গুরুরা শিষ্যদের ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত করাচ্ছে না। বিবেকানন্দ একশো বছর আগে বলে গেছেন, এখন সারা পৃথিবীতে মহাতমোগুণের প্রবাহ চলেছে। চাই মহারজোগুণের জাগরণ। কথাটায় আমাদের জ্যেষ্ঠরা বিশেষ গুরুত্ব দেননি। আপনারাও মিলিয়ে দেখুন আজকালকার ছেলেদের যদি জোর করে রামায়ণ পড়িয়ে দেওয়া যায়, তাহলে তারা শিখবে, পরস্ত্রী হরণে কোন পাপ নেই। রাবণ করেছিল। মহাভারত পড়লে শিখবে, আধ হাত জমির জন্য ভাইয়ে ভাইয়ে লাঠালাঠি করা চলে। শরৎচন্দ্র পড়লে শিখবে, ভালো লেখক হতে গেলে আগে মাতাল হওয়া দরকার। রবীন্দ্রনাথ পড়লে শিখবে, কবিতা লিখতে গেলে ম্যাট্রিক পাশের কোন দরকার নেই। ধর্মগ্রন্থে যাই লেখা থাকুক, ব্যক্তি যে গুণে অবস্থান করছে, তার মন যে গুণে অবস্থান করছে সে সেই ভাবে গ্রহণ করবে। তমোগুণের আধার, তার রুচি, খাদ্যাভ্যাস বদলের মধ্যে দিয়ে গুণের পরিবর্তন না ঘটিয়ে সত্ত্বগুণীয় ধর্মে প্রবেশের অধিকার দিলে তার আচরণে অসংগতি থাকবেই।

তাই অহোরাত্র কীর্তন করা ব্যক্তিকে দেখতে পাচ্ছি, কীর্তন নয় কীর্তন শব্দটি উল্টে দিলে যায় দাঁড়ায় তার চরিত্রে সেটাই ফিট্।

এই অসঙ্গতি বা স্ববিরোধিতা আজ অধিকাংশ ধার্মিক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে। তাই সাধারণ মানুষও লুকোচুরির জীবন অর্থাৎ স্ববিরোধিতার জীবনকেই স্বাভাবিক জীবন মনে করছে। ওপরে নিরীহ ভদ্র পরিপাটি হওয়া এবং ভেতরে চরিত্রভ্রষ্ট। দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিবিদ কিংবা ঘুষখোর অফিসার প্রত্যেকই ভাবেন আমার এই পাহাড় প্রমাণ অপরাধকে সামলাবার জন্য শক্তিশালী গুরুরা আছেন। তাঁদের কৃপা পাবোই। পাচ্ছেনও। গত জন্মের সংস্কার, সুকৃতি এই জন্মের সাধনা, তপস্যা যা দিয়ে সাধু সন্ন্যাসীরা পরমার্থের সন্ধান নেবেন, ঈশ্বরের অনুভূতি লাভ করবেন। এটাই তো তাঁদের কর্তব্য, কিন্তু এই শক্তি দিয়ে তাঁরা সেবা করছেন অসত্যের, অশুভের, বদমাইসদের। সনাতন ভারতের এই বিয়োগান্ত পরিণতি বেদব্যাস, বাল্মিকীরাও ভাবতে পারতেন কিনা সন্দেহ, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি বশিষ্ঠ, চাণক্য, সমর্থ-স্বামী, রামদাসের দেশের ধর্মগুরুরা অসাধু ব্যবসায়ী, অসৎ রাজনীতিকদের নিষ্ঠাবান সেবাদাসে পরিণত। তার কারণ এঁরা ধার্মিক নন। সারল্য, তেজ, সাহস, কৃচ্ছ্রসাধন এঁদের কিছুই নেই। স্নিগ্ধতা আছে, সেটা দুশ্চিন্তাহীন জীবন এবং সুখাদের কল্যাণে। অন্যায়ের সঙ্গে শত্রুতা করে কোন ঝুঁকি নিতে চান না। তমোগুণাচ্ছন্ন দেশে একেই ধর্ম বলা হচ্ছে আর এর সরবরাহকারীদের বলা হচ্ছে ধার্মিক ব্যক্তি।

এগুলো কারো বিরুদ্ধে অনুযোগ নয়। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে যে দেশে ধর্মের বন্যা চলেছে, উর্বর পলিমাটিতে ভরে রয়েছে সারা প্রান্তর, সহস্র মহাপুরুষ যেখানে কর্ষণ করে গেছে যুগে যুগে দেবত্বের, মানবতার সেখানে এতোদিন পরে মনুষ্যত্বের এতো মন্বন্তর কেন? একটা সম্পূর্ণ মানুষ চোখে পড়ে না কেন? প্রণিপাত করে এই প্রশ্ন আমার সমসাময়িকদের কাছে। আমার প্রণম্যদের কাছে। গড্ডালিকা প্রবাহ থেকে মাথা তুলে একবার পিছন ফিরে দেখা উচিত, আত্মসমীক্ষা করা উচিত। যে পদ্ধতি প্রকরণে আমরা ধর্মচর্চা করে আসছি তা কি শুধু একটা যান্ত্রিক অভ্যাস মাত্র অথবা প্রাণহীন একটা প্রথা?

এক এক সময় অবাক হয়ে ভাবি, বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ যে দেশের মণীষার সৃষ্টি, যেখানে ঈশ্বর নিজে এসে বারংবার লীলাচ্ছলে লোক শিক্ষা দিয়ে গেছেন, স্বকণ্ঠে আবৃত্তি করেছেন অমৃতময় গীতা, দীপান্বিতার সেই দেশে কেন এতো অন্ধকার।

কোন ব্যক্তির কাছ থেকে এর সদুত্তর পাইনি, উত্তর পেলাম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের একটি ঘটনা থেকে। ইতালীর বেনিটো মুসোলিনী তাঁর প্রসাদের ঝুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে নীচে দাঁড়িয়ে থাকা শ্রেণীবদ্ধ সৈনিকদের নির্দেশ দিলেন অবিলম্বে ইথিওপিয়া আক্রমণ করতে। একটি পায়রার পালক নিয়ে বললেন ঃ এটা আমি এখানে ফেলে দিচ্ছি, যে বাহিনীর ওপর এই পালকটা পড়বে তারাই ইথিওপিয়া প্রথম আক্রমণ করার অধিকার অর্জন করবে। পালক ফেলে দিয়ে চলে গেলেন ফুয়েরার। সাত দিন পরে যুদ্ধের খবর জানতে চাইলেন সেনাপতিদের কাছে। একজন বললেন যুদ্ধ তো শুরুই হয়নি, আক্রমণ করবে কে? ফুয়েরার বললেন ঃ কেন যাদের ওপর পালকটা পড়বে। সেনাপতি বললেন ঃ পালকটা নীচে পড়েনি ফুয়েরার, সৈনিকেরা ফুঁ দিয়ে সেটা সাতদিন ধরে উঁচুতেই রেখে দিয়েছে। ঘটনাটার সত্য মিথ্যা আমার জানা নেই। আমাদের দেশে কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে ঠিক এই জিনিসটাই হয়েছে। সকল মহাপুরুষের সকল বক্তব্য ফুঁ দিয়ে ওপরেই রেখে দিয়েছি, আমাদের ওপর পড়তে দিইনি। গ্রহণ করেছি সকলকে, কাউকে অবলম্বন করিনি। তাই হৃদয় আমাদের শূন্য, পরিপূর্ণ আত্মপ্রবঞ্চনায়। কথাগুলো অপ্রিয় সত্য, এ সত্য ছড়িয়ে আছে সর্বত্র।

নিত্য গীতা পাঠ করেন গীতার ব্যাখ্যা করেন তাঁর সামনে একটা খুন হোক, তিনি দেখেও সাক্ষী দেবেন না। বলবেন আমার নিরাপত্তা কোথায়? এটাই আত্মপ্রবঞ্চনা। ইনি গীতা গ্রহণ করেছেন, অবলম্বন করেননি। গীতা অবলম্বন করলে কি হয় তার প্রমাণ তো এদেশে আছে। মজঃফরপুরের বৃদ্ধ উকিল ষোল বছরের কিশোর ক্ষুদিরামকে বললেন ঃ তোমার ফাঁসী রদ হতে পারে ক্ষুদিরাম, তুমি সই করে দাও আমি হাইকোর্টে আপীল করি। ক্ষুদিরাম মরণজয়ী হাসি হেসে বলল, স্যার আপনি ঘাবড়াবেন না, আমি গীতা পড়েছি। আমাকে ফাঁসী দেওয়া যায় না, আগুনে পোড়ানো যায় না, জলে ডোবানো যায় না। এটা কোনো মঞ্চে নাটকের ডায়লগ নয়, যে এইসব বলে তারপরেই গ্রীনরুমে গিয়ে বিড়ি ধরাবে ক্ষুদিরাম। যার কদিন পরে ফাঁসী হবে। ভগৎ সিং ফাঁসীর আগের দিন রাত্রে কাঠকয়লা দিয়ে দেওয়ালে লিখে রাখলেন ঃ

দর দিওয়ার পে হাম হসরত কো নজর করতে হ্যাঁয়,
খুশ রহো অহলে বতন হাম তো সফর করতে হ্যাঁয়।

এর মানে, দরজায় এবং দেওয়ালে আমি সর্বত্র ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাচ্ছি, হে আমার দেশবাসী তোমরা খুশী থেকো, আমরা তো এইভাবেই বারবার আসি আর

যাই। এদের গীতা মুখস্থ ছিল না, হৃদয়স্থ ছিল। তাই জীবন মৃত্যু এদের পায়ের ভৃত্য ছিল। আর চারপাশে যেসব গীতাপাঠে, সঙ্কীর্তনে, ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত ব্যক্তিদের দেখছি, তারা কিসের দাস? তাদের অধিকাংশই অর্থের দাস, নারীর দাস, খ্যাতির দাস, ভোগের দাস অর্থাৎ প্রবৃত্তির দাসানুদাস। ধর্মের প্রথম কথা যদি প্রবৃত্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ হয়, আর শেষ কথা হয় মৃত্যু ভয় জয়, তাহলে বলতে বাধ্য হতে হয় চতুর্দিকে যা চলছে তা ধর্ম নয়। ধর্মের নামে মহাতমোগুণের পশু হুঙ্কার।

তাই প্রথমেই লিখেছি, নিজের দিকে গভীরভাবে প্রতিটি ধর্মাচরণকারীর ফিরে দেখা দরকার। ধর্ম তো লক্ষ্য নয় উপলক্ষ্য মাত্র। ধর্ম তলোয়ারের মতো, তলোয়ারে আমরা ধার দিই অন্য কিছু কাটবার জন্য। তলোয়ারে শুধুমাত্র ধার দেওয়াই তলোয়ারের জীবন লক্ষ্য নয়। ধর্মকে বন্দুকের নলের সঙ্গেও তুলনা করা যেতে পারে। হাত দেড়েক নলটার ভূমিকা হচ্ছে গুলিটার লক্ষ্য স্থির করে দেওয়া। গুলিটাকে শিলে ফেলে রেখে নোড়া দিয়ে ফুটিয়ে দেওয়া যেতে পারে। তাতে কোনোরকমে টোটাটা ফুটে গেলেও লক্ষ্য ভেদ হয় না। আমাদের এই জীবনভ্রমররূপী গুলিটার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমপ্রিয় পরমেশ্বরের শ্রীচরণ পদ্মে অথবা ব্রহ্মবোধের কেন্দ্রবিন্দুতে লক্ষ্যভেদ করা। লক্ষ্য থেকে চ্যুত হয়ে উপলক্ষ্য সর্বস্বত্বই আমাদের সকল সর্বনাশের কারণ। আসলে আমরা যখন জন্মগ্রহণ করি তখন পশুর সঙ্গে আমাদের বিশেষ প্রভেদ থাকে না। ক্রমবর্ধমান চেতনা এবং নিত্য সংস্কার ধীরে ধীরে আমাদের মনুষ্যত্ববোধের জাগরণ ঘটায়। মনুষ্যত্বের জংশন থেকে আমাদের যাত্রা শুরু হয় দেবত্বের স্টেশনের দিকে। এখানেই শেষ নয়। দেবতা হওয়া লক্ষ্য নয়। দেবতাদেরও কামনা, বাসনা, নীচতা, ক্ষুদ্রতা আছে। দেবত্বের স্টেশনে নেমে এক্কাগাড়ী করে পৌঁছতে হবে ব্রহ্মোপলব্ধির অসীমতায়। অবাঙ মানসগোচর-অমিয়-সাগরে। তার বিবরণ নেই, রসাস্বাদন আছে। সেখানে বিভূতি নেই, আছে শুধু অনুভূতি।

ঠিক ট্রেন না ধরার ফলে জংশন পৌঁছে আমাদের সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। পশু থেকে মানুষ, মানুষ থেকে দেবতা, দেবতা থেকে ঈশ্বরে একাত্ম হওয়া,এই হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য। কুসংস্কার ও চৈতন্যহীনতা আমাদের পৌঁছে দিচ্ছে অন্যত্র। মনুষ্য দেহ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে আমরা সংগ্রহ করছি পশুত্ব। পশুত্ব থেকে ধীরে ধীরে জড়ত্ব। তাই জড়ত্বসম্পন্ন মানুষকে অমৃতলোকের সন্ধান দিলেও সে গ্রহণ করতে পারে না, পারছেও না। সে অমৃত বলতে বুঝবে মদ্য। কোন বস্তুর প্রতি, খাদ্যের প্রতি লুব্ধ হয়ে বলবে আত্মা চাইছে। আত্মা মানে সে বুঝবে, উদর মাত্র। ধর্ম বলতে বুঝবে

চীৎকার। অমায়িক ধার্মিক ব্যক্তি অহোরাত্র মাইক বাজিয়ে পাড়ার লোককে বিনিদ্র রেখে ভাববে, একটা কাজের কাজ করলাম। এই আড়ম্বর চীৎকার প্রচার ধর্ম নয়, ধর্মের বিকৃতি। এই বিকার সারা দেশকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। তাই জপ, কীর্তন, প্রবচন, পান, ভোজন, ধোঁয়া, জলপথ চলছে একযোগে। অশালীন শব্দ, অনর্গল খিস্তি তাদের মুখে শোনা যাচ্ছে, যারা ধর্মচর্চা করেন এবং কোন না কোন গুরুর শিষ্য।

প্রবৃত্তির উপর লাগাম নেই, জিভের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই। বল্গাহীন জীবন নিয়ে মহাজীবনের সন্ধান, মহাহট্টগোল ছাড়া আর কি প্রসব করতে পারে? স্রষ্টা আমাদের সৃষ্টি করেছেন বিশেষ ইঙ্গিত দিয়ে। সে ইঙ্গিত আমরা বুঝতে পারি না। ঈশ্বর আমাদের শোনবার যন্ত্র দিয়েছেন দুটো এবং তা খোলা। অর্থাৎ ঈশ্বরের ইঙ্গিত যতো খুশী শোনো আপত্তি নেই। অথচ বলবার যন্ত্র দিয়েছেন একটা। তাও ওপরে ঠোঁটের ঢাকনী, ভেতরে দাঁতের বেড়া। ইঙ্গিতটা এই, ঠোঁটের ঢাকনা খুলে দাঁতের বেড়ার ফাঁক দিয়ে যা বলবে, ভেবে চিন্তে বলবে। অপ্রয়োজনীয়, অশালীন, কুরুচিপূর্ণ কথা বলবে না। হিন্দীতে প্রবাদ আছে সমঝদারকে লিয়ে ইসারা হি কাফি হ্যায়। অর্থাৎ বুদ্ধিমানদের জন্য ইশারাই যথেষ্ট। স্রষ্টার এই ইশারা আমরা ধরতে পারিনি বলেই তাঁর ইঙ্গিত আমাদের জীবনে সঙ্গীত হয়ে উঠতে পারেনি। সাধারণ মানুষ এগুলো ধরতে না পারলেও অসাধারণ অর্থাৎ গুরুস্থানীয়, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের এগুলো ধরা উচিত ছিল, ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল। তাহলে মানুষের মুখের ভাষা এতো অশ্লীল হয়ে উঠত না। জীবন হয়ে উঠত না আবর্জনা।

ধর্ম নিয়ে নেগেটিভ কথা বলছি অনেকক্ষণ। ধর্মে কতো অপ্রয়োজনীয় আবর্জনা প্রক্ষিপ্তভাবে ঢুকে পড়েছে। তথাকথিত ধর্মগুরুরা ধর্মকে কোথায় নিয়ে এসেছেন। ধর্মের নামে এই দেশটায় ঠিক কি চলছে তার চলচিত্র আঁকছি। খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চাইছি প্রবৃত্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ, তেজ, স্নিগ্ধতা, ঔদার্য্য, সহিষ্ণুতা, মৃত্যুভয় জয় এগুলো হচ্ছে ধর্মচর্চার বিভিন্ন লক্ষণ। প্রত্যেকটি বস্তুর নিজস্ব কিছু স্বাদ চরিত্র থাকে। উচ্ছে মিষ্টি হলে আমরা সন্দিগ্ধ হই, শশা, কাঁকুড় তেতো হলে বিরক্ত হই।

সারা দেশ জুড়ে ধর্মচর্চা চলছে। অনুসন্ধানী ব্যক্তিদের হিসেবে এই খণ্ডিত ভারতবর্ষে এখন মঠ মন্দিরের সংখ্যা চৌত্রিশ লক্ষ আর সাধু-সন্ন্যাসী-মোহন্তদের সংখ্যা আটান্ন লক্ষ। ঠাকুরঘরে, ক্যালেন্ডারে, টেবিলে, লকেটে প্রায় প্রত্যেকটি বাড়িতে একদঙ্গল ঠাকুর-দেবতা-মহাপুরুষের অবস্থান। প্রত্যেকটি পাড়ায়, প্রতিটি অফিসে বিদ্যালয়ে

কোনো না কোনো গুরুর একাধিক শিষ্য আছেই। বিকেন্দ্রীত হলেও ধর্মের চেয়ে বড়ো ইন্ডাস্ট্রি এখন ভারতে নেই। কিন্তু এই ইন্ডাস্ট্রির উৎপাদন ফলটা কি?

একটি কারখানায় তিন শিফটে কাজ চলছে। যথেষ্ট সংখ্যক শ্রমিক সারাদিন কাজ করছে, নানারকম আওয়াজ হচ্ছে, কিন্তু আউটপুট নেই; কোন উৎপাদন নেই। কেন নেই? একটু যারা জেগে আছেন, একটু সচেতন তাদের মধ্যে এই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, সন্দেহ জাগাও স্বাভাবিক যে ধর্মের নামে যা চলছে তার সিংহভাগটুকুই নির্ভেজাল কাপট্য। অধিকাংশ গুরু কপট, তাদের শিষ্যরাও কপট। তাই শব্দ আছে. চিৎকার আছে, ছুটোছুটি আছে কিন্তু আউটপুট নেই। ধর্মরূপী ইন্ডস্ট্রির উৎপাদন ধার্মিক ব্যক্তি। সেটাই নেই। এই সন্দেহ, এই অভিযোগ, এই প্রশ্নের উত্তরে একটি স্বাভাবিক প্রতিপ্রশ্নও উত্থিত হতে পারে।

সেটা হচ্ছে, এই কাপট্য, এই আত্মপ্রবঞ্চনা, এই মিথ্যা হাজার বছর ধরে চলে আসছে কেমন করে? এর উত্তরে খুব বিনীতভাবে বলা যেতে পারে, প্রখ্যাত অভিনেতা গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় চিত্রে, মঞ্চে, যাত্রায় টাকা মাটি, মাটি টাকা বলে দুটোই ফেলে দিয়ে, সাজঘরে গিয়ে বলছেন, টাকা দাও। শান্তিগোপাল মঞ্চে বিবেকানন্দ সেজে বলছে মা, আমায় শ্রদ্ধা ভক্তি দাও। আড়ালে বলছে একটি পয়সা কম দিলে যাত্রা হবে না। এইসব নাটকও চলছে হাজার রজনী ধরে। আমি এঁদের কটাক্ষ করছি না, এঁরা স্বক্ষেত্রে প্রশংসনীয়। এসবের আউটপুটও আছে। যথা—অর্থলাভ যশোলাভ।

কিন্তু হাজার বছর ধরে ধর্মের নামে যে অভিনয় চলছে, তার আউটপুট কি? তার আউটপুট হচ্ছে হাজার বছরের দাসত্ব। দাসত্ব করতে করতে মনুষ্যত্বের বিলুপ্তি। দাসত্বের কালে হাজার হাজার মন্দির ধ্বংস, দেবদেবীদের নিগ্রহ, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিধন, মাতৃজাতির প্রতি লাঞ্ছনা, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' উচ্চারণের সঙ্গে জাত্যাভিমানের বেড়া তুলে মানুষে মানুষে সৃষ্ট ঘৃণার প্রাচীর। আর এখন? দারিদ্র-রোগ-শোক-মিথ্যাচার-কাপুরুষতা-ভণ্ডামী এই হচ্ছে আমাদের ধর্ম কারখানার হাজার বছরেরও সামগ্রিক উৎপাদন। বিরল ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-দয়ানন্দ-অরবিন্দ-প্রণবানন্দ প্রমুখরাই তার প্রমাণ। কিন্তু এই মাইক্রোস্কোপিক ব্যতিক্রমই তো প্রমাণ করছে নিষ্ঠুর নিয়মটাকে। এমনটা কেন হচ্ছে, আমাদের গভীরভাবে ভাবা দরকার। সেই ভাবনাই এই ক্রুদ্ধ লেখার প্রতিপাদ্য। ক্রুদ্ধতার উদ্দেশ্য শুদ্ধতায়, বুদ্ধতায় উত্তীর্ণ হওয়া। ধর্মের লক্ষণও তাই। বোধ এবং কল্যাণের হাত ধরে প্রজ্ঞায় আরোহণ করা।

একথা তো সত্য মানুষ মূলতঃ শুদ্ধ-বুদ্ধ-পবিত্র। তাহলে সে এতো কদর্য কলুষিত হয় কি করে। তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর কাউকেই তো আমরা এভাবে কল্পনা করিনি। কৃষ্ণ ভক্তরা কৃষ্ণকে দুটি রূপে অঙ্কিত করেছেন, ঐশ্বর্য্যময় রূপ এবং মাধুর্য্যময় রূপ। বহু কৃষ্ণভক্তের আচরণে যেটা ফুটে ওঠে তা একান্তই কদর্য্যময় রূপ।

এটা কেন? সূর্য্য সাধনায় ব্যাপৃত মানুষ অন্ধ তামস হয় কেমন করে? এই একাধিক প্রশ্নের একটি উত্তর রবিঠাকুরের ভাষায় বলি ঃ জড়িয়ে গেছে সরু মোটা দুটি তারে, জীবন বীণা ঠিক সুরে তাই বাজে নারে। দুটি তার নয় তিনটি তারে আমাদের জীবন জড়িয়ে গেছে। প্রচণ্ড ভাবের তাড়নায় আমরা সূক্ষ্মতা হারিয়েছি। তাই সব ভাবনাগুলো মিলেমিশে জড়িয়ে একাকার হয়ে জটিল হয়ে গেছে। তাই অধিকাংশই ধার্মিক মানুষ স্ববিরোধিতার রোগী। চিন্তায়, বিচারে, দর্শনে, ঐশ্বর্য্য কিন্তু আচরণে, অভ্যাসে কদর্য। চরিত্রে সংলগ্নতার বড়োই অভাব।

এই স্ববিরোধিতা আজ জীবনের সর্বত্র। রতি এবং আরতি চলছে একযোগে। তার কারণ জীবনের যে ক্রম, যে সিঁড়ি তা ভেঙে সহজে সোজাপথে আমরা উঠতে চাইছি না, লাফিয়ে উঠতে চাইছি। তাই পদস্খলনটা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ঘটে যাচ্ছে। সমগ্র বিশ্বচরাচরে যেমন তিনটে গুণ ক্রিয়াশীল সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। ঠিক মনুষ্যজীবনেও তিনটে স্তর রয়েছে ব্যষ্টি, সমষ্টি, পরমেষ্টি। আমরা চরিত্রের কথা বলি। চরিত্র হচ্ছে মনুষ্যরূপী গতিশীল গাড়িটার একমাত্র স্টিয়ারিং। এই চরিত্রও তিনটে অংশে বিভক্ত— ব্যক্তিগত চরিত্র, জাতীয় চরিত্র এবং আধ্যাত্মিক চরিত্র।

আমি আছি বলে তো এই পৃথিবী, এই ধর্ম, অধর্ম সবকিছু। সুতরাং সর্বাগ্রে চাই ব্যক্তিগত চরিত্র। ব্যক্তিকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করা, নিয়মিত ব্যায়াম, শিষ্টাচার, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা, ভোরবেলা জাগরণ, সত্য কথন, ঠিক সময়ে ঠিক কাজ করা, নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা, সাহস, বিনয় এইসব ছোট ছোট গুণ হচ্ছে ব্যক্তি চরিত্রের বুনিয়াদ। আজকে এই ব্যক্তি চরিত্র নির্মাণের কোন প্রচেষ্টা কোথাও নেই। তাই সমাজের সম্মুখীন হওয়া মাত্রই প্রলোভন প্রতিষ্ঠার সামনে মেরুদণ্ডহীন প্রাণীতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। কারণ ব্যক্তি চরিত্রের অভাব। ব্যক্তি চরিত্র নিষ্ঠা সহকারে যদি কেউ সংগ্রহ করে, তারপরই তাকে সংগ্রহ করতে হবে সমষ্টি চরিত্র বা জাতীয় চরিত্র। যে সমাজ থেকে সে সবকিছু সংগ্রহ করে নিজেকে সমৃদ্ধ করল তার প্রতি কর্তব্য অপরিহার্য।

এই চরিত্রের উপাদান হলো দেশপ্রেম, নিজ দেশের ঐতিহ্য পরম্পরার প্রতি, শ্রদ্ধাশীল থাকা। দেশকে ইঁট, কাঠ, গাছ, পাথরের সমষ্টি মনে না করে সাক্ষাৎ

জননীরূপে অনুভব করা। দেশের প্রতি অপমান, দেশের ভূখণ্ডের সামান্য অংশ অন্য রাষ্ট্রের দখলে থাকলে মনের মধ্যে বৃশ্চিক দংশনতুল্য যন্ত্রণা হওয়া। এতে দেশ, জাতি কখনো নিজ দেশবাসীর হাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। আজ দেশের এই চূড়ান্ত অধঃপতনের কারণ দেশপ্রেমহীনতা বা জাতীয় চরিত্রের অভাব। ব্যক্তি চরিত্র এবং জাতীয় চরিত্র সংগ্রহ করার পরেও বাকী থাকে পরমেষ্টি চরিত্র বা আধ্যাত্মিক চরিত্র।

ব্যক্তি এবং সমাজের আড়ালে যে বিশ্বনিয়ন্তা নীরবে কাজ করে যাচ্ছেন, তার অনুসন্ধান হচ্ছে ঈশ্বরীয় চরিত্র। এ অনেকটা শিক্ষাসূচীর মতো। মাধ্যমিক পাশ, স্নাতক হওয়া, তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী। তিনটি স্তরে বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। তেমনি তিনটি চরিত্রের যে স্তর তার সমন্বয়ে একটি সফল মানুষ। পরিশ্রম বাঁচাতে গিয়ে কেউ যদি বলে আমি একেবারে এম.এ. পরীক্ষা দেবো, তবে তার রেজাল্ট কি হবে? আমরা সমগ্র সৃষ্টিকেই মোটামুটি তিনটি মাত্রায় কল্পনা করেছি। থ্রি-ডাইমেনসন বা ত্রিস্তর। যেমন স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়, সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ, দেবতা-মানব-অসুর, শরীর-মন-আত্মা এইরকম অসংখ্যা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে; এবং তাতে প্রমাণ হবে আমরা সত্যিই একটা ত্রৈমাত্রিক চরাচরে রয়েছি। আমাদের সমস্ত কল্পনা সত্য-বোধ-বুদ্ধি প্রজ্ঞা-স্বজ্ঞার উৎস হচ্ছে ব্যক্তি মানুষ। এই মানুষের মধ্যে সীমা এবং অসীম, অন্ত এবং অনন্ত সমান্তরালভাবে সহাবস্থান করছে। আমরা ব্রহ্মময়ীর বেটা, অনন্ত শক্তি আমাদের মধ্যে লুকিয়ে আছে এও যেমন সত্য, তেমনি অসংখ্য মায়া, মোহ, প্রবৃত্তি পীড়িত এই পৃথিবীতে দৃশ্য অদৃশ্য রিপুদলের সঙ্গে সংঘর্ষ এবং জয়লাভ করতে করতে এই জীবন একদিন শেষ হয়ে যাবে এও সত্য। এই অন্ত এবং অনন্তের মধ্যে অনেকে তালগোল পাকিয়ে ফেলেন। যেমন বহু মানুষ জীবন এবং জীবিকাকে একাকার করে ফেলেন। জীবিকার মধ্যে জীবনকে হারিয়ে ফেলে আর খুঁজে পান না। প্রত্যেকটি মানুষ শশব্যস্ত তার জীবিকা নিয়ে, তাই জীবন সায়াহ্নে পৌঁছে যাওয়া প্রৌঢ়কে জিজ্ঞাসা করলেও বলতে পারেন না তাঁর জীবনলক্ষ্য কি ছিল? অনেক মানুষ সকালে চা খাওয়ার সময়ও বলতে পারেন না তাঁর সারাদিনের কার্যসূচী কি? এতো কথার কথকতার মালা গাঁথছি একটাই প্রশ্ন নিয়ে যে জীবনের জগতের বৃহৎ সত্যকে অনুসন্ধান করার, উপলব্ধি করার সময়টা এক জীবনে বড়োই কম। অসীমকে আমরা খুঁজবো তো এই সীমাবদ্ধ দেহ মন বুদ্ধি দিয়েই। চেতনার স্ফূরণ ঘটতেই ষোলো বছর লেগে যায় সব মানুষেরই। আধুনিক

মনোবিজ্ঞান বলছে আটাশ বছরের পর মন আর নতুন কিছু শিখতে গ্রহণ করতে পারে না। তর্কের খাতিরে ওটা যদি আরও বারো বছর বাড়িয়ে দিই তাহলে ষোলো থেকে চল্লিশ। হাতে রইল চব্বিশ। শরীর-মন-বুদ্ধির সক্রিয়তা, তীক্ষ্ণতা ধরে নিচ্ছি এই বয়স পর্যন্ত অটুট থাকবে। তাতেও অনেক সময়ের বাজে খরচ রয়েছে। জীবনের এক তৃতীয়াংশ আমাদের কাটে শুধু নিদ্রায়, তারপর কাটে আহারে, বিহারে, বিশ্রামে, প্রমোদে, ব্যাধিতে। সেটাও এক তৃতীয়াংশ। জীবিকার জন্য এক তৃতীয়াংশ। নিজেকে নির্মাণের জন্য সময় নেই। যে জীবন দিয়ে জীবনেশ্বরের অনুসন্ধান হবে তার দিকে মনোযোগ দেবার, তাকে যোগ্য করার কোন প্রচেষ্টা নেই। অতিকষ্টে কিছু সময় দিলেও সেটা প্রয়োজনের তুলনায় বড়োই কম, তাই জীবন আমাদের শূন্য। শূন্য কুম্ভ বলেই এতো শব্দ, এতো চীৎকার, এতো ভড়ং, এতো আত্মপ্রবঞ্চনা। অনেকে বলেন ধর্মকর্ম তো বৃদ্ধ বয়সের কাজ। যৌবনে কেন ? এ সম্পর্কে একটি চমৎকার গল্প আছে।

মানুষের গোটা জীবনটায় প্রকৃত মানুষরূপে বেঁচে থাকার আয়ুষ্কাল কতটুকু ? বিধাতা সকল প্রাণীকে আয়ু নির্দ্ধারণ করে দিচ্ছেন। সমদর্শী বিধাতা সকলকে চল্লিশ বছর করে গড় আয়ু দিলেন। মানুষ বুদ্ধিমান প্রাণী, এতে সন্তুষ্ট হলো না। রাস্তায় একটা গাধার সঙ্গে দেখা, বললে তুমি একটা নির্বোধ গাধা, সারাজীবন বোঝা বইবে। তোমার এতো আয়ুর কি দরকার ? আমাকে কুড়ি বছর দাও। গাধার বিবেচনায় কুড়ি বছর যন্ত্রণা মুক্তি হচ্ছে। দিয়ে দিল। এরপর দেখা একটি কুকুরের সঙ্গে, তাকেও বোঝাল মানুষ। করুণার উচ্ছিষ্ট খাবে, পাহারা দেবে এই তো জীবন তোমার। দাও আমাকে কুড়ি বছর। পেয়ে গেল ওখানেও। তারপর দেখা এক শকুনের সঙ্গে। বুদ্ধিমান প্রাণী মানুষ, তার যুক্তির অভাব নেই। তাকে বলল মড়া খেঁয়ে ঘৃণিত জীবনযাপন করে এতো দীর্ঘায়ুর দরকারটা কি? বাড়লো আরো কুড়ি। নিজের চল্লিশ ছিলই। সাকুল্যে একশো হলো। চারপাশে আমরা দেখছিও তাই। মানুষের মতো বাঁচাটা ওই চল্লিশ বছর পর্যন্ত। তারপর নীরবে ধুঁকতে ধুঁকতে সংসারের বোঝা বহন করা। অর্থাৎ গাধা, ষাটের পর ওই দুটো খাওয়া, ছেলে পুরী যাচ্ছে অথবা সিনেমায় সস্ত্রীক। বলে যাচ্ছে বাবা বাড়িটা দেখবেন, মানে কুকুর। তারপর তিনমাথা এক, প্রায় শকুনের জীবন। কিন্তু সবটাই মহাজীবন হয়ে উঠতে পারে যদি ওই চল্লিশ বছর পর্যন্ত আমরা সচেতন থাকি। ধর্মকে পলিত কেশ, গলিত চর্ম, শিথিল ইন্দ্রিয়গ্রামের কালের জন্য শিকেয় তুলে না রেখে কিশোরকাল থেকেই গ্রহণ করা, অবলম্বন করা উচিত। আজকাল অনেকে গ্রহণ করছেন, অবলম্বন করছেন না। অবলম্বন করলেও,

সিস্টেমেটিক ওয়েতে অর্থাৎ একটা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে তা করছেন না। তাই জট খুলতে গিয়ে জটিল হচ্ছে জীবন।

ধর্মের অনেক আগে আরো কিছু প্রস্তুতির দরকার। মারের আগে যেমন ধমকানি, জেলের আগে হাজত, মারামারির আগে বচসা। তেমনি ধর্মের আগে জানতে হয় সমাজকে, তারও আগে ব্যক্তিকে নিজেকে। শুধু জানলে হয় না। এরজন্য কিছু অভ্যাসও দরকার, তাতে গড়ে ওঠে চরিত্র। এই চরিত্রও ত্রৈমাত্রিক ত্রিস্তর। ব্যষ্টি চরিত্র, সমষ্টি চরিত্র এবং পরমেষ্টি চরিত্র। এই তিনটি তার ঠিক ঠিক টান করে বাজাতে পারলে আরতি, না পারলে রতি কিংবা বিরতি। অধিকাংশ মানুষ তাই এখন একটি গোঁজামিলের যোগফল। ব্যক্তির গুণের কথা কিছু আগেই বলেছি। এইসব ছোট ছোট গুণগুলো ব্যক্তি চরিত্রের ভিত্তি। প্রত্যহ ভোরে ওঠা শরীর মন দুটোকে সুস্থ করে সবল করে। যোগী যে হবো কেমন করে হবো? আমরা তো প্রত্যেকই রোগী। রোগ সারলে রোগী থেকে ভোগী হতে পারি যোগী কখনই নয়। মাতৃজাতির প্রতি শ্রদ্ধা, এতে প্রথম প্রবৃত্তিটা দুর্বল হয়ে যায়, বশে থাকে। কোনরকম নেশাকে প্রশ্রয় না দেওয়া, এতে আত্মবিশ্বাস কমে যায়, নিজের কাছে নিজেকে ছোট মনে হয়। কথার মূল্য রাখা, কথা দিয়ে কথা রাখতে পারলে নিজের মধ্যে একটা মর্যাদাবোধ জাগ্রত হয়, শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হয়। সত্য কথা কষ্ট করে কিছুদিন বলতে পারলে ওটা অভ্যাসে পরিণত হয় এবং তারমধ্যে একটা মহাশক্তির জাগরণ ঘটে। একটু ব্যায়ামে শরীরের ভারসাম্য ঠিক থাকে। সদ্‌গ্রন্থ পাঠে মনটা পবিত্র হয়। একটু ধ্যানে বসা মানে একধরণের স্নান হয়। দেহের স্নান আমরা প্রত্যহ করি। মন, আত্মা এগুলো যে রুক্ষ হয়ে থাকবে তারজন্যই ধ্যান। এগুলো সব ব্যক্তিগত গুণ, ব্যষ্টি চরিত্র।

এই চরিত্র দৃঢ় হওয়ার পর, সমষ্টি চরিত্র বা জাতীয় চরিত্র। সমগ্র দেশ আমার মাতৃভূমি, সারাদেশের মানুষ আমার ভাই। এই দেশের সভ্যতা সংস্কৃতি পরম্পরা ঐতিহ্যই আমাকে মানুষ করেছে অতএব আমার কোনো আচরণে দেশ যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। এই মানসিকতা, এই আচরণও দীর্ঘদিন ধরে অভ্যাস করতে হয়, আয়ত্ত করতে হয়। মায়ের প্রতি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকার মতো দেশমাতার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে হয়। তাহলে একদেশে একই সময়ে ব্রহ্মচর্চা আর বিচ্ছিন্নতা পাশাপাশি চলে না। যাগযজ্ঞ, বেদপীঠ, কীর্তনের সময় বলছি, আমরা মানুষ, ঈশ্বরই সব। কিন্তু সারাটি জীবন পরিচয় দিচ্ছি বাঙালি-বিহারী-হরিজন-ব্রাহ্মণ-শিখ-বৌদ্ধ অমুক গুরুর শিষ্য বলে। তার কারণ সমষ্টি চরিত্রের শিক্ষা আমাদের নেই। এতোবড় দেশের

অধিবাসী হলে তার হৃদয় শিক্ষা-ভাষাও হবে বৃহৎ, সংযত ও সুন্দর। কিন্তু তা কোথায়? যথেষ্ট শিক্ষিত ধর্মচর্চাশীল ব্যক্তিকে দেখতে পাচ্ছি বাঙাল ঘটির পার্থক্য করতে ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণে দূরত্ব সৃষ্টি করতে। বিহারীকে ছাতু, মাড়োয়ারীকে মেড়ো, উৎকলবাসীকে উড়ে, পাঞ্জাবীকে পাঁইয়া বলতে। সব অশ্রদ্ধাজ্ঞাপক শব্দ, অজ্ঞতাসূচক শব্দ। তার কারণ, আমাদের জাতীয় চরিত্র নেই। হিন্দীতে কথা বললে তাকে আমরা হিন্দুস্থানী বলি। মনে হয় না আমরা সবাই হিন্দুস্থানী, হিন্দুস্থানের অধিবাসী। অন্যকে হিন্দুস্থানী বললে নিজেকে অন্যস্থানের অধিবাসীরূপে চিহ্নিত করা হয়।

এই সমষ্টি চরিত্র না থাকার ফলে আজ সারাদেশে বিশৃঙ্খলা। একটা ভালো নেতা কোন জগতে দেখা যাচ্ছে না; যিনি সমগ্র সমাজকে দেশকে ধরে রাখবেন। ধর্মজগতেও নেই, রাজনৈতিক জগতেও নেই। ব্যক্তি চরিত্র, জাতীয় চরিত্র শূন্য। ব্যক্তির ধর্মচর্চা টবে আমের চাষের মত। গাছ হবে, একটা ফল হবে না, হচ্ছেও না। নৈতিকতার, চরিত্রের আদর্শের সঙ্কট এতো তীব্র হয়েউঠছে বহু লোক প্রশ্ন তুলেছেন পরান্নভোজী পরিশ্রমবিমুখ এতো সাধুসন্ন্যাসীর এ দেশে কোন প্রয়োজন সত্যিই আছে কিনা? এও নির্বোধের প্রশ্ন। শুধু ব্যক্তি চরিত্র এবং জাতীয় চরিত্রই সফল জীবনের শেষ কথা নয়। পরেমষ্টি জীবন চাই, চাই আধ্যাত্মিক জীবন। নেতা হয়ে আমি বলদর্পী হবো না, অত্যাচারী, লোভী হবো না এর গ্যারান্টি কি? অর্থের প্রলোভনে আমি বিকিয়ে যাবো না কখনও যখন সন্ধান পাবো পরমার্থের। তাই ঈশ্বর সন্ধান অবশ্যই চাই। বিদ্যালয়ের শিক্ষাসূচীর তুলনা দিয়েছিলাম। ব্যষ্টি চরিত্রের পরীক্ষায় আমরা ব্যর্থ হচ্ছি। জাতীয় চরিত্রের পরীক্ষাতেও ফেল। আমরা যাচ্ছি আধ্যাত্মিক পরীক্ষা দিতে। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই, সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক সাধন করতে যাচ্ছি। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে এখানেই। মনুষ্যত্বহীন ধার্মিক, চরিত্রহীন রাজনীতিবিদ, মাতাল সাহিত্যিক সাংবাদিক, লোভী অর্থসর্বস্ব পণ্ডিত তৈরী হচ্ছে এই কারণেই। সব জগতে আমরা চাইছি মেডইজি। ওয়ান নাইট প্রিপারেশনের মতো শূন্যতা ফাঁকিবাজী পূরণ করতে চাইছি একরাত্রে। ঈশ্বর লাভ তাই কখনো হয়!

হয় না। হয় না বলেই সমাজে জীবনে এতো অসঙ্গতি, এতো স্ববিরোধিতা। তিনটে চরিত্রের ক্রম অনুযায়ী সামঞ্জস্য চাই। তবেই ব্যক্তি জীবনে, সমাজ জীবনে এবং আধ্যাত্মিক জীবনে সঙ্গতি আসবে। মানুষের মধ্যে স্ববিরোধিতা দেখা দেবে না। এখন অধিকাংশ মানুষ স্ববিরোধিতার রোগী। যেহেতু এই তিনটি চরিত্রের তার জড়িয়ে

গেছে। এই স্ববিরোধী মানুষের সংখ্যা এতো বেশী যে তাঁদের খোঁজবার পরিশ্রম করতে হবে না। চারপাশে যথেষ্ট ছড়িয়ে আছে। একটু সতর্ক থাকলেই দেখা যায়। এদেশের ধর্মদর্শনের সহজ কথা প্লেন লিভিং হাই থিঙ্কিং মানে সরল জীবন মহৎ চিন্তা। এটা হয় চরিত্রের সঙ্গতি থাকলে। চরিত্রের অসঙ্গতি কি কৌতুক এবং কারুণ্যের সৃষ্টি করে তার দু-একটি দৃষ্টান্ত দিই। চোখ কান খোলা থাকলে এগুলো সকলেরই চোখে পড়বে।

এদেশে বহু ব্যবসায়ী আছেন যিনি বিভিন্ন মঠে নিয়মিত অর্থ সাহায্য করেন, মন্দির প্রতিষ্ঠায় ঈর্ষণীয় চাঁদা দেন, ভোরে পায়রাকে ক্ষুদ, পিঁপড়াকে চিনি খাওয়ান, সকালে দু'ঘণ্টা জপ, তারপর জলস্পর্শ। পরিচ্ছন্ন ধুতি, পরিপাটি চুল, কপালে চন্দনের ফোঁটা, হরেকৃষ্ণ অথবা জয়রামজীকি সম্বোধনে প্রত্যেককে নমস্কার। পাড়ার প্রত্যেকটি লোক বলে সদানন্দবাবু অমায়িক ধার্মিক ব্যক্তি। অথচ তিনি যে ব্যবসাটি করেন সেটি ভেজাল ওষুধের। কোটি কোটি মানুষ তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তিনি ভাবেন ওটা আমার ব্যবসা, ওতে পাপ হয় না। যদি একটু আধটু পাপ হয়ও, তারজন্য তো দান-ধ্যান করি, দেব দ্বিজে ভক্তি করি, অবলা প্রাণী পায়রা, পিঁপড়েকে খেতে দিই, আর কি। তাছাড়া গীতায় পড়েছি কৃষ্ণ বলছেন, অর্জুন তুমি নিমিত্ত মাত্র। ভেজাল ওষুধ খেয়ে মানুষ মরলে আমার কি? আমি তো নিমিত্ত। গীতার কি অদ্ভুত ব্যাখ্যা!

এই সজ্জনের ব্যক্তিগত চরিত্র আছে, একটু ধর্মভাবের ভাণও আছে কিন্তু জাতীয় চরিত্র বা সমষ্টি চরিত্র বলে কিছু নেই। জাতির ক্ষতিকে এঁরা ঠিক ক্ষতি বলে মনে করেন না। মানুষ হিসাবে এঁরা অসম্পূর্ণ, বিকৃত। আর একদল মানুষকে আমরা দেখতে পাই। যাদের সত্যিই সমাজ নিয়ে, রাষ্ট্র নিয়ে খুব চিন্তা। সকালে গরীবের মেয়ের বিয়ের জন্য চাঁদা তুলছে, দুপুরে শ্রমিকদের দাবীদাওয়া নিয়ে মিছিল করছে, বিকেলে চীনের ভারত আক্রমণের প্রতিবাদে ভীষণ ভাষণ দিচ্ছে। সবসময় রাষ্ট্রচিন্তা। কিন্তু মধ্যরাত্রে এই দেশপ্রেমী শায়িত থাকেন বগলে বোতলসহ নর্দমার ধারে অথবা পতিতালয়ে। বক্তৃতায় অহেতুক উত্তেজনা ভুল তথ্য অর্থাৎ মিথ্যা। এই দেশপ্রেমীর প্রত্যহ দু'বাণ্ডিল বিড়ি লাগে। একটু বামাক্ষ্যাপা ভাবও আছে, মানে মেয়ে দেখলে ক্ষেপে ওঠেন। এক কথায় এই ব্যক্তি জাতীয় চরিত্রসম্পন্ন কিন্তু ব্যক্তিগত চরিত্র বলে কিছু নেই। এও অসম্পূর্ণ মানুষ। আর একদল মানুষ রয়েছেন আমাদের আশেপাশে। নিজের বাবা মা উপেক্ষিত হলেও এরা ঠনঠনে কিম্বা তারাপীঠে গিয়ে 'মা' 'মা' ধ্বনিতে দিক্‌দিগন্ত কম্পিত করেন। যথার্থই কাঁদেন, সবকথায় ঈশ্বরকে যুক্ত করে

কথা বলেন। সবই তাঁর ইচ্ছায় চলছে এইরকম একটা ভাব। মুখে বলেছেন 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। কিন্তু সুদের পয়সা ঠিকই গুণে নিচ্ছেন, নির্দয়ের মতো। একটি দিনেরও সুদ ছাড়ছেন না। হিমালয়কে দেবতাত্মা বলছেন মহাদেবের আবাস ভাবছেন। কিন্তু হিমালয়ের দশহাজার বর্গমাইল শত্রু কবলিত হয়ে থাকলে ওই ভক্তদের চিত্ত ব্যথিত হয় না। হা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ করে চোখের জলে বুক ভাসানো কৃষ্ণভক্ত এদেশে কম নয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মুখ নিঃসৃত অমৃতময় বাণী গীতা কাশ্মীরে নিষিদ্ধ হলে এদের কীর্ত্তন বিঘ্নিত হয় না, ব্যক্তিগত জীবনে কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। রামনামে মাতোয়ারা কিন্তু রামচন্দ্রের মন্দির মসজিদ হয়ে গেলে এঁরা বিচলিত হন না। পাঁচটা টাকা হারিয়ে গেলে কিন্তু বিচলিত হন। অর্থাৎ এঁদের একটা বিচিত্র অবাস্তব আধ্যাত্মিক চরিত্র থাকলেও ব্যক্তি চরিত্র জাতীয় চরিত্র বলে কিছুই নেই। এরাও অসম্পূর্ণ মানুষ। এই অমস্পূর্ণ, বিকৃত মানুষে দেশ ভর্তি। তাই সমাজের সকল অংশে বিশৃঙ্খলা। ধনাঢ্য ব্যক্তিরা যেমন যেন তেন প্রকারেণ অর্থ সংগ্রহ করে ভাবেন, আমি আছি আর আমার অর্থ সম্পদ আছে জগতের সকল সুখ-স্বাধীনতা আমার করায়ত্ত। কিন্তু লক্ষ্য করা যায় দেওয়ালে, গ্রীলে, কোলাপ্সিবল গেটের বন্ধনে বন্ধনে তিনি নিজেই কোণঠাসা হয়ে পড়েন। সম্পদ রক্ষার আতঙ্কে খরগোস-এর মতো তটস্থ হয়ে থাকেন। নানারকম বে-আইনী কাজ করার জন্য একটা কনষ্টেবল থেকে পাড়ার গুণ্ডাদের কাছেও জোড়হস্ত হয়ে থাকেন। প্রত্যেকটি অপছন্দের ক্লাবকে, রাজনৈতিক দলকে চাঁদা দিতে বাধ্য হন। অথচ তিনি মনে মনে ভাবেন আমি সবাইকে হাতে রেখে দিয়েছি। আসলে তিনিই সকলের হাতে থাকেন। অসম্পূর্ণ মানুষের ভাবনা চিন্তাগুলোও অসম্পূর্ণ থাকে। সম্পূর্ণ করে তারা ভাবতে পারে না। শুধুমাত্র পরমেষ্টি চরিত্র সম্পন্ন ব্যক্তিরা এইরকম। তিনি ভাবেন কোনোরকমে একটু আধ্যাত্মিক শক্তি সংগ্রহ করতে পারলেই ব্যস, বাকী সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু হয় না যে তার প্রমাণ তাকালেই চোখে পড়ে। ধর্মচর্চাকারী অধিকাংশ মানুষের জীবন অসঙ্গতিতে পরিপূর্ণ অসংখ্য দুর্বলতা যুক্ত। কোন ব্যক্তি যদি কাউকে ঘুঁসি মারবার জন্য শুধু একটি হাতের ব্যায়াম করে, সে কি সুস্থ শরীরের অধিকারী হবে? শরীর, মন, আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ চাই। শারীরিক বলিষ্ঠতাই যদি সাফল্যের শেষ কথা হয়, তাহলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা দারা সিং-এর। আধ্যাত্মিক শক্তি শেষ কথা হলে দেশ চালাতো সাধু সন্ন্যাসী গুরুরা। কিন্তু আমরা প্রতিটি অঞ্চলে কর্তৃত্ব করতে দেখি গুণ্ডা বদমাইসদের। কারণ তান্ত্রিক ব্যক্তিদের অন্য চরিত্রগুলি নেই। ব্যষ্টি, সমষ্টি এবং পরমেষ্টি জীবনের সামঞ্জস্য বিধান

চাই। এগুলো সুপরিকল্পিতভাবে ব্যক্তির মধ্যে রূপায়ণ চাই। মনুষ্যত্বের উপাদান বর্জিত ব্যক্তিদের নিয়ে যাই করা হোক তা বিশৃঙ্খল, ভণ্ডুল হবেই। তাই সংবাদপত্রে পড়তে হয় ছ' হাজার টাকা মাইনের ইঞ্জিনিয়ার বাঁধ তৈরী করতে গিয়ে সিমেন্টের সঙ্গে গঙ্গামাটি মিশিয়েছেন। এই ইঞ্জিনিয়ার হয়তো রামকৃষ্ণ মিশনের শিষ্য, রোটারী ক্লাবের সদস্য। এ ক্লাস ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু জাতীয় চরিত্র শূন্য। তাই আমাদের সকলের এখন পিছন ফেরা দরকার।

পরিস্থিতি নিরপেক্ষ ধর্ম, ধর্ম নয়, ধর্মের নামে ভণ্ডামী। সমাজ নিরপেক্ষ ধর্ম শুধু আত্মপ্রবঞ্চনা নয় স্বার্থপরতা। কোটি যোজন দরে ধ্রুবলোক, ব্রহ্মালোকের নামে কল্পলোকে না ঘুরে বাস্তবে দৃষ্টি ফেরানো উচিত। ধর্মকে অবাস্তব কল্পনার মধ্যে না রেখে দৈনন্দিন অভ্যাসে চারপাশে প্রযুক্ত করা উচিত। এ বিষয়ে মহাপুরুষদেরও ইঙ্গিত আছে। বছর আশি আগে এক তেজস্বী প্র্যাকটিক্যাল সন্ন্যাসী বলেছিলেন এই সমাজ সেই মহামায়ার ছায়া মাত্র। বলেছিলেন বহুরূপে ঈশ্বর তোমার সম্মুখে রয়েছে। ভণ্ড ভক্তরা এসব কথায় কান দেয়নি। তাহলে জাতীয় চরিত্রে এতো বিপর্যয় আসতো না। যে দেশে একটি খাদ্যবস্তু নির্ভেজাল পাওয়া যায় না, যে দেশে বহু রাজনৈতিক দল, ধর্মীয় দল টিকিট না কেটে ট্রেনে চাপা অপরাধ মনে করে না, সেদেশে ধর্ম আছে, ধর্ম ছিল, এ বিশ্বাস ভণ্ড, অসুস্থ কিম্বা মহাপুরুষে করতে পারে, সুস্থ স্বাভাবিক মানুষে নয়। তাই এদেশে ধর্ম প্র্যাকটিক্যালিটি বাস্তবতা, বুদ্ধিগ্রাহ্যতা হারিয়ে নির্বোধ এবং ভণ্ডদের আশ্রয় হয়েছে। প্রবঞ্চনা ছেড়ে তাই সকল ধার্মিকের সমাজমুখী, রাষ্ট্রমুখী হওয়া দরকার। গুরুস্থানীয় ব্যক্তিদের সর্বাগ্রে। সবই ঈশ্বরের লীলা না বলে, তারা নিজেরা কিছু লীলা দেখান। ভেজালের কারবারী, ক্ষতিকর রাজনৈতিক নেতা, ঘুসখোর অফিসার শিষ্যদের বলুন, তোরা রৌরব নরকে যাবি, আমি অভিসম্পাত দিচ্ছি। তাতেও কাজ না হলে শিষ্য হিসাবে তাদের পরিত্যাগ করা। আসল গুরুদেবদের অনেকেরই জাতীয় চরিত্র নেই। শাঁসালো শিষ্য চলে গেলে চর্বচোষ্য, সিল্কের গেরুয়া চলে যাবে। আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর, ব্যবসামুখী গুরুদের ঝুঁকি নেবার হিম্মত নেই।

এ ঝুঁকি নেবার সৎসাহস ছিল তাদের, যাদের সমষ্টি চরিত্র অর্থাৎ, জাতীয় চরিত্র ছিল প্রখর। কল্পলোকো তেত্রিশ কোটি দেবতা নয়, এই মাতৃভূমিই যাদের কাছে ছিল আরাধ্যা দেবী। জননী। তাই ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, বাঘাযতীন, সূর্য সেন জীবনমৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে বৃটিশ সিংহের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। আজকের সমাজের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, বুদ্ধিজীবি ধর্মগুরুরা গোটাকতক দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিবিদ, ভেজালের কারবারী

ধনাঢ্য ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে লড়তে ভয় পান। কারণ জাতীয় চরিত্রহীনতা। এই সমাজ, এই রাষ্ট্র আমার এ অনুভূতি তাদের নেই। বহু শক্তিধর সাধুসন্ন্যাসী, ধর্মগুরুরা রাস্তায় নেমে এসে বজ্রহুংকারে যদি আহ্বান করেন ঃ ঈশ্বরের আশীর্বাদপুত সন্ন্যাসী আমরা, মনুষ্য সৃষ্ট অই অনাচার, অসাম্য, অসঙ্গতি, অন্যায় আমরা মানিনা। বরচিত আত্মপ্রবঞ্চনার কারাগার থেকে বেরিয়ে এস মনুর সন্তানেরা। প্রবৃত্তির বিষকুম্ভ থেকে উঠে এস অমৃতের পুত্রগণ। যদি বলতে পারেন, শোনো বিশ্বজন, শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ। দিব্যধামবাসী আমি জেনেছি তাঁহারে, মোহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে, জ্যোর্তিময়। তারে জেনে তার পানে চাহি, মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পারো অন্য পথ নাহি। মৃত্যুভীতিজীত সন্ন্যাসী আমরা, এই প্রপঞ্চময় মিথ্যা জগতে কাকে ভয়? একটি আহ্বানে এই জীর্ণ দেশ উত্তীর্ণ হতে পারে মৃত্যু থেকে অমৃতে, অন্ধকার থেকে আলোকে। কিন্তু কোথা সেই দিব্যজ্যোতি সাধু যিনি বহুজনহিতায় নিজ সুখ বিসর্জন দেবেন, দিতে পারেন? যাঁর জীবন লক্ষ্য একটি নিরাপদ সংসারের মতোই নিশ্চিত আশ্রম নয়, ক্লান্তিহীন, প্রাপ্তিহীন কঠোর শ্রম। কোথা থেকে সেই শ্রমিক সন্ন্যাসী? যার স্বেদ, অশ্রু, তেজ অখণ্ড পবিত্রতার প্রবাহরূপে সারা সমাজকে শুদ্ধ করবে। আশ্রম, কীর্তন, দীয়তাং ভূজ্যতাং চলুক কোন আপত্তি নেই। কিন্তু এগুলোও একটা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠান দিয়ে কোন বড় মৌলিক পরিবর্তন হয় না। মহাজনেরাই বলেছেন প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠার পঙ্কে পা ডুবে গেলে সেখান থেকে উঠে আসা শক্ত। তাই প্রতিষ্ঠান নয় সংগঠন চাই, সম্যকরূপে গঠন।

মনুষ্যত্বের উপাদানে সম্যকরূপে গঠিত ব্যক্তিগুলোর মধ্যে চাই প্রবল জাতীয় চরিত্র বা ন্যাশনাল কারেক্টার। আজ মুনি, ঋষি, সাধু, সন্ত, পণ্ডিত, অধ্যাপক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী, গুরুদের বড় অংশ এই ন্যাশানাল কারেক্টার বর্জিত। তাই এখানে দুটি একটি আশ্রম, দু'একজন বাবা, সন্ন্যাসী, মোহান্ত, দূরের কিছু ভক্ত, চারপাশে কিছু শত্রু বিশিষ্ট ব্যক্তি। মাঝে মাঝে উৎসবে ভীড়, পণ্ডিত, বুদ্ধিজীবিদের মাঝে মাঝে কিছু লেখা, বিবৃতি, সম্মেলন, সন্ধ্যেটা একা নিঃসঙ্গ ক্লাবে কিম্বা বারে। সমাজের গভীরতম সমস্যাগুলো সম্পর্কে ঔদাসীন্য। প্রত্যক্ষ সম্পর্কহীনতা। কোনটায় রাজনীতি আছে বলে এড়িয়ে যাওয়া। জাতীয় চরিত্রের চর্চাহীনতায় অর্জিত হয়েছে এই পলায়নী অভ্যাস। সেটাকেই ভাবছি নিরাপত্তা, ভাবছি ধর্ম। এগুলি ধর্ম নয়, জীবন নয়।

চরিত্রের তিনটি দিকের সফল সামঞ্জস্য বিধানে একটি পরিপূর্ণ মানুষ হয়। এই সম্পূর্ণ মানুষ জীবনের যে ক্ষেত্রেই থাক সে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে না। নিজের মধ্যেই

থাকবে তার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা, কারণ তার ব্যক্তিগত চরিত্র আছে। তার বাণী এবং কৃতির মধ্যে ঐক্য থাকবে। সে যে সংগঠনেই থাকুক গ্রুপিং করবে না। পার্সোন্যালিটি ক্ল্যাশ অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ ঘটিয়ে অশান্তি ডেকে আনবে না। কারণ তার সমষ্টি চরিত্র আছে। অনেক মানুষকে নিয়ে একসাথে চলবার মতো ঔদার্য সহিষ্ণুতা সে অর্জন করেছে, ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্বল্য, মান অভিমান, নিজেকে বড় করতে গিয়ে অন্যকে ছোট করার যে সব বদভ্যাস তা থেকে সে মুক্ত। এই মানুষ যদি আধ্যাত্মিকতার দিকে এগোয়। তবেই তার সাফল্য আসবে। এই দুটি চরিত্রকে প্রায় উপেক্ষা করে সারা দেশ ধর্মচর্চায় মত্ত। তার ফল কয়েক সহস্র মন্দিরের অধিকার নিয়ে মামলা চলছে। বড় যে কোন গুরু অর্থাৎ যে গুরুর শিষ্য সংখ্যা বেশী তাদের একাধিক গ্রুপিং ঠিক রাজনৈতিক দলের গ্রুপের মতোই পরস্পর যুযুধান। তার কারণ এঁরা ভক্ত হয়েছেন শিষ্য হয়েছেন, কিন্তু মানুষ হননি। মানুষ এমনি হয় না, তাকে নির্মাণ করতে হয়, প্রাসাদের মত, মন্দিরের মতো।

ব্যক্তিগত চরিত্র হচ্ছে তার ভিত্তি। গোটা বাড়ীটাকে সেই ধরে রাখে। অথচ সে থাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে। ভিতরে ইঁটকে বেশ ভালোভাবে পুড়তে হয়। তার কাঁচা থাকলে ভাঙা থাকলে চলে না, বেশী পুড়ে গিয়ে ঝামা হয়ে গেলে চলবে না। আমাদের সমাজের বহু পণ্ডিত জ্ঞানের আগুনে পুড়ে ঝামা হয়ে গেছেন, বেঁকে চুরে উঁচুনীচু হয়ে গেছেন। একটার সঙ্গে আর একটা কিছুতেই বসানো যায় না। এরাও ভিতের ইঁট হবার অযোগ্য। তবে জীবনের ধন কিছুই ফেলা যায় না। ঝামা ইঁট ভেঙে খোয়া হয়। খাল ভরাট করতে, সোলিং করতে কাজে লাগে। ভিত তৈরী করে তারপর বিল্ডিং। বিল্ডিং তৈরী হচ্ছে জাতীয় চরিত্র। বাড়ীর উঁচুতলাটি কিম্বা মন্দিরের চূড়াটি হচ্ছে পরমেষ্টি চরিত্র বা স্পিরিচ্যুয়াল ক্যারেক্টার। ভিতের ইঁট কিম্বা দেওয়াল হবার ইচ্ছেটা আমাদের কম। পরিশ্রম বেশী, লোকের দৃস্টি আকর্ষণ করা যায় না এমন কাজে মন টানে না, তাই আমাদের সবার ইচ্ছা মন্দিরের গম্বুজ হবার, চূড়া হবার। ভিত নেই, দেওয়াল নেই, গম্বুজ আছে, এই করুণ হাস্যকর মনোভূমিকা যে দেশের মানুষের তাদের দেশে যা হওয়া উচিত তাই হচ্ছেও। ব্যক্তিগত লোভ, ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা, দলাদলি, পরচর্চার উর্দ্ধে কিছুতেই উঠতে পারছি না। জাতীয় দুর্যোগ অর্থাৎ বিদেশী আক্রমণ, পরাধীনতা তারও মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়ে, অত্যাচার, ধর্মনাশকে ভবিতব্য বলে মেনে নিয়েছি। শুধু গম্বুজের জীবনে তো কোন মর্য্যাদা নেই। সেটা কাকের বিষ্ঠা ক্ষেপনের নির্দিষ্ট স্থান রূপে ব্যবহৃত হয় মাত্র। দেওয়াল আঘাতকে প্রতিরোধ করে,

ভিত্তি তাকে দৃঢ়মূল করে। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের ভিতও খুব নড়বড়ে, জাতীয় জীবনেরও তাই।

সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নির্বাচন প্রতিনিধিদের ঠিক গরু ছাগলের হাটে বিক্রীত পশুর মত কেনা যায় এদেশে। টাকা অথবা মন্ত্রীত্বের ক্রয় মূল্যে। শহরের সর্বাধিক দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসায়ী কিম্বা কুখ্যাত রাজনৈতিক নেতার বাড়ীতে ওঠেন শ্রদ্ধেয় জগদ্‌গুরুতুল্য ব্যক্তিরা। বুদ্ধিজীবি সাংবাদিকেরা বিদেশের টাকা নিয়ে স্বদেশের সংস্কৃতিকে আক্রমণ করেন কারণ আমাদের চরিত্রের ভিত্তি দুর্বল। কোদালকে কোদাল বলার সাহস আমরা হারিয়েছি, খনিত্র বলে একটা গোলমাল পাকিয়ে তুলি। একটা মানুষ একটা বিল্ডিং-এর মতোই। একটু একটু করে সুপরিকল্পিতভাবে তাঁকে নির্মাণ করতে হয়। আমাদের এই বিচিত্র দেশে সব জিনিষ পরিকল্পনা করে হয়। একটা ড্রাফট্‌স্‌ম্যানের চাকুরীর বিজ্ঞাপনেও লেখা থাকে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা চাই। কিন্তু মানুষকে মানুষ তৈরী করার জন্য পরিকল্পনা এদেশে হয় না। মনুষ্যত্বের কোন অভিজ্ঞতার দরকার নেই, ওটা গড্ডালিকা স্রোতে ছেড়ে দিয়েছি। আনপ্ল্যানড মানুষ দিয়ে প্লানড সমাজ গড়তে চাইছি। বড় বড় আদর্শের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল তৈরী করছি। দলের সাইনবোর্ড আছে, কার্যসূচী আছে, নেতা আছে, শুধু মানুষ নেই। তাই আজ দেশের সমাজের সবদিকে একটা নৈরাশ্য, হতাশা, আস্থাহীনতা। আমেরিকায় প্রচলিত একটি গল্প আছেঃ দুই বন্ধু লিফট্ খারাপ থাকায় চুরাশি তলায় সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো। ফ্ল্যাটের বন্ধুটি অন্য বন্ধুকে বোঝাতে লাগল তার ফ্ল্যাটের সৌন্দর্য সমৃদ্ধি। প্যারিস থেকে দ্য ভিঞ্চির ছবি কিনে এনেছে, শহরের সবচেয়ে বড়ো কোম্পানীকে দিয়ে ডিসটেম্পার করিয়েছে। চুরাশি তলা পর্য্যন্ত এইসব গল্প করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যখন ঘরের সামনে পৌঁছল, পকেটে হাত দিয়ে দেখে ঘরের চাবিটা আনা হয়নি। নীচের তলায় মানে একেবারে একতলায় যেখানে বসে ওরা গল্প করেছিল সেইখানে ভুল করে ফেলে এসেছে।

এত বিশ্ববিদ্যালয়, এত মঠমন্দির, এত কলকারখানা সব আমাদের বাহন না বোঝা হয়ে উঠেছে। কারণ মনুষ্যত্ব সংগ্রহের চাবিকাঠিটা আমরা একতলায় ফেলে এসেছি। তাই সাফল্যের দরজায় এসেও আমরা ঘর খুলতে পারছি না। স্বীকারও করতে চাইছি না। তাতে যন্ত্রণা আরো বাড়ছে। অস্বস্তি ব্যাধি চাপা দিচ্ছি শরীরে দামী জামা প্যান্ট চাপিয়ে। অন্তরের সৌন্দর্য্য নিঃশেষ তাই বাক্যবিন্যাস দিয়ে নিজেকে আড়াল করতে চাইছি। আধুনিক সভ্যতার যেগুলো অন্যতম অবদান 'শিল্প-বিজ্ঞান-

সাহিত্য' তাকে আকণ্ঠ গলাধঃকরণ করেছি। শিল্প আমাদের ভোগস্পৃহ করেছে, বিজ্ঞান করেছে অতৃষ্ণ, আর সাহিত্য আমাদের শিখিয়েছে সোজা কথাগুলো ঘুরিয়ে, পেঁচিয়ে বলতে। এরই যোগফলে আমরা একটা কৃত্রিম জটিল অন্তঃসারশূন্য স্ববিরোধী মানুষ। আমাদের ধর্ম, সাহিত্য, রাজনীতি সবটাকেই আমাদের ভোগের প্রবৃত্তির সহায়ক শক্তিরূপে ব্যবহার করতে চেয়েছি। মনুষ্যত্বের চাবিকাঠিটা একতলায় পড়ে আছে একথা স্বীকার করারও সাহস আমাদের নেই। অথচ এই কঠিন সত্যকে একদিন না একদিন স্বীকার করতেই হবে। চরম সর্বনাশ হবার আগে এই সত্যকে স্বীকার করে নেওয়াই বুদ্ধিমত্তা এবং দূরদর্শিতার লক্ষণ। মনুষ্যত্বের উপাদান লুকিয়ে আছে তিনটি চরিত্রের পরিপূর্ণ বিকাশ এবং সামঞ্জস্য বিধানে। এগুলো চীৎকারে, প্রচারে, সভা করে নয় একান্তে দৈনন্দিন অভ্যাসে ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তায় নিজের চরিত্রে নিজেই আনতে হবে পরিবর্তন। পৃথিবীর প্রত্যেকটি সুশিক্ষিত মানুষই স্বশিক্ষিত। ওপরতলা নয়, গম্বুজ নয়, এমনকি দেওয়ালও নয়, সর্বাগ্রে চাই ভিত। দৃঢ় ব্যক্তিচরিত্র। যার ভরসায় গড়ে উঠবে দেওয়াল, ছাদ। কৃত্রিমতার, আড়ম্বরের খোলসটা ছেড়ে দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র ঈশ্বর, বাদ দিয়ে আগে দেখতে হবে নিজেকে। যে বস্তুটি আমি রাষ্ট্রদেবতা কিম্বা ঈশ্বরের চরণে নিবেদন করবো, সেই বস্তুটি আসলে কি? সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে নিজের জন্য। এই দেহটা, মনটা যেটা আমার এটাই তো আমার সবচেয়ে কাছের বস্তু। এটাকেই তো আগে ঠিক করা দরকার। তারগুলো টান টান করে বাঁধা দরকার। যাতে ঠিক মতো বাজে। শ্রীকৃষ্ণকে একদিন রাধা জিজ্ঞাসা করল, নাথ, কুল, মান সব ত্যাগ করে সর্বস্ব দেবার পরও তুমি মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা করো, আর এই বাঁশীটা তোমার সঙ্গে থাকে সর্বক্ষণ, কেন? কৃষ্ণ হেসে বললেন ঃ রাধা, এই বাঁশীটা আমার জন্য কি করেছে শোনো। একে ঝাড় ছাড়া করেছি অর্থাৎ আত্মীয় স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন করেছি, আমার খুশীমতো ও আমাকে কাটতে দিয়েছে, আগুন দিয়ে ওকে পুড়িয়েছি নির্দয়ভাবে ওর বুকে ফুটো করেছি, কোন প্রতিবাদ করেনি। এতো অত্যাচারের পরও ও আমার কতো বাধ্য জানো? আমি ওকে দিয়ে যে সুরে বাজাতে চাই তাই বাজে। বেসুরা বাজে না। ওর ত্যাগের সমর্পণের কোন তুলনা হয় না রাধা। রাধা নির্বাক তাকিয়েছিল। আর কোনদিন বাঁশীকে ঈর্ষা করেনি। এই ছোট্ট ঘটনার নির্গলিতার্থ হচ্ছে কারো আপন হতে গেলে তার মনের মতো হতে হয়। তার প্রতি প্রবল আনুগত্য রাখতে হয়। শিবপূজার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি বলতে গিয়ে বলা হয়েছে, শিবো ভূত্বা শিবং

যজেৎ। শিব হয়ে যাওয়াই শিবপূজার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। সব পূজোরই এই পদ্ধতি হওয়া উচিৎ। যাঁরা ঈশ্বরকে ঘুঁষখোর অফিসার কিম্বা চরিত্রহীন জমিদারতুল্য মনে করেন তাদের পূজোর উপাচার আসে উপঢৌকনরূপে। অহোরাত্র নামগান হয় বিশুদ্ধ চাটুকারিতা। একটিকে ঘুষ বলা যায় অন্যটিকে মোসাহেবী কর্ম। ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ঈশ্বরকে আমরা একটু কলা, কয়েক দানা চিনি দিই খাদ্যরূপে, অখণ্ড পবিত্রতার আধার ঈশ্বরকে আমরা আহ্বান করি কলুষিত হৃদয়ে কামনামাখা চিত্তে। ভগবান সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষের অবচেতন মনের ধারণা তিনি নির্বোধ, জড়ভরত, নড়েভোলা একটি বস্তু। নইলে নিজেদের ইচ্ছেগুলোকে পরিবর্তিত না করে, চরিত্রকে শুদ্ধ না করে, হৃদয় মাধুর্যমণ্ডিত না করে তাঁকে আমরা প্রত্যাশা করি কি করে? এক জীবনের স্ত্রী খুঁজতে গিয়ে আমরা কী কাণ্ড করি, শিক্ষা, সৌন্দর্য্য, বংশ, রন্ধন দক্ষতা, সঙ্গী, অধিকার কি নয়? একটা চাকর রাখতে গেলে খুঁজি সে যেন পরিশ্রমী হয়, বাধ্য হয়, বিশ্বস্ত হয়। ঈশ্বর আমাকে তাঁর অনুরাগী ভক্তরূপে চিহ্নিত করার আগে একবারও দেখবেন না, আমার বিশ্বস্ততা, পবিত্রতা, আন্তরিকতা? তিনি সব দেখেন, তিনি অনন্ত চক্ষু, অন্তর্যামী। আমাদের প্রতি মুহূর্ত্তের খবর তাঁর জানা। মাল হিসাবে আমরা কি দরের তা তিনি জানেন। জানেন বলেই এই কৃত্রিম পূজোপাঠ, তীর্থযাত্রা, কীর্ত্তনে শুধুমাত্র আমাদের অহং তৃপ্ত হয়। এসবে ঈশ্বর রুষ্ট হন। সব অরণ্যে রোদন হয়। রুষ্ট ঈশ্বরের দীর্ঘশ্বাস পতিত হয় প্রকৃতিতে। প্রকৃতি বিশৃঙ্খল হয়। প্রবৃত্তি-পরায়ণ মানুষের জীবনে নেমে আসে অভিশাপ। ঈশ্বরও নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা। ইচ্ছে করলেই তিনি কল্যাণ করতে পারেন না কারো। তাহলে জগৎ কল্যাণে যুগাবতার রামকৃষ্ণ আরো কয়েকটা বিবেকানন্দ তৈরী করে দিয়ে যেতেন। বিবেকানন্দ দুশো ছেলের জন্য দাপিয়ে বেড়াতেন না। শ্রীকৃষ্ণ, পুত্র শাম্বকে ভদ্র করতে পারতেন। অসীম ক্ষমতার অধিকারী হয়েও এদের এই সীমাবদ্ধতা কেন? ভালো আধার না পেলে কখনও কারো পক্ষেই কিছু করা সম্ভব নয়। ঈশ্বরের করুণা বৃষ্টিধারার মতো অনর্গল বর্ষিত হচ্ছে। জমছে সেখানে, যেখানে পাত্রতা আছে। সুতরাং সব যোগ বিয়োগ গুণ ভাগের শেষে উত্তর একটাই, নিজেকে ঠিক করতে হবে। নিজের চরিত্রের বুনিয়াদটা ঠিক করতে হবে। পরিবারের প্রতি, সমাজের প্রতি কর্তব্যে অটল থাকতে হবে। নিজেকে শুদ্ধ-বুদ্ধ-পবিত্র-নির্মল করতে হবে। ঈশ্বর যাবেন কোথায়? তাঁর আশ্রয়তো একটাই, ভক্তহৃদয়। একটা উর্দু কবিতায় আছে—

খুদি কো কর বুলন্দ ইত্‌না, কি হর লহজে মে ইঁউ পহেলে।
খুদা বান্দে সে খুদ পুছে, বাতা তেরী রেজা কেয়া হ্যায়।।

মানে, নিজেকে এতো উদাত্ত এবং পবিত্র করে তৈরী কর যে প্রত্যেকটি কাজে নামবার আগে ঈশ্বর নিজেই তার বান্দাকে এসে জিজ্ঞাসা করবেন, বলো, আমি তোমার কি কাজে লাগতে পারি? মনে পড়ে যাচ্ছে কবীরেরও একটা এইরকম চমৎকার দোঁহা আছে। দোঁহা মানে বাংলায় যাকে দ্বিপদী বলে। কবীর বলছেন ঃ

কবীরা মন এ্যয়সা নির্মল চাহিয়ে য্যায়সে গঙ্গা নীর
পিছে পিছে হরি চলত কহত কবীর কবীর.......

মানে, কবীর, মন এমন নির্মল কর যেন গঙ্গোদক তুল্য হয়, তবেই পিছনে পিছনে ঈশ্বর স্বয়ং কবীর কবীর বলে চলতে থাকবেন। ঠিক এই ধরণের চরিত্র নির্মাণ করতে পারছি না বলেই ঈশ্বর বারংবার ধরার ধূলিতে আমাদের জন এসে ফিরে যাচ্ছেন। হৃদয় আমাদের অস্বচ্ছ, দৃষ্টি স্বার্থদুষ্ট, তাই তাঁকে দেখেও চেনার, ধরার ক্ষমতা আমাদের নেই। মনুষ্যদেহ নিয়ে ভারতে জন্মগ্রহণ করে ঈশ্বরের কৃপাকণা যে বিন্দুমাত্র অনুভব করতে পারলো না, তার চেয়ে হতভাগ্য জীব আর কেউ নেই। পৃথিবীর কোন দেশে ভগবান স্বয়ং এসে উলঙ্গ ত্রৈলঙ্গরূপে, অর্দ্ধোন্মাদ রামকৃষ্ণরূপে,শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে অযাচিত করুণা বিতরণ করেন না। ছিদ্রান্বেষী বুদ্ধি, সন্দিগ্ধ মন অর্থাৎ পাত্রের ছিদ্রতার কারণে এই অযাচিত করুণাধারার ভগ্নাংশও ধরে রাখার ক্ষমতা আমাদের নেই। সেই হতভাগ্য কাঠুরের জীবন আমাদের। যে চন্দন গাছের বাগান পেয়েও নিজের দারিদ্র ঘোচাতে পারলো না। সে চন্দন গাছ চিনতো না, বাজে কাঠের দামে বাজারে বিক্রী করে গেল। পৃথিবীর কোন দেশে ঈশ্বর স্বয়ং জন্মগ্রহণ করেন না, তাঁর প্রতিনিধিরা জন্মান।

সকল সাধকেরা স্বীকার করেছেন, জন্মভূমি-পুণ্যভূমি সবদেশে, কিন্তু মোক্ষভূমি এই ভারতবর্ষ। তাই পৃথিবীর কোন সাধকের দাবী নেই, ঈশ্বর দর্শন করার, শুধু ভারতবর্ষ ছাড়া। এই মোক্ষভূমির মাটিতে জন্মগ্রহণ করে মনুষ্যদেহ ধারণ করে আহার, নিদ্রা, তাস, পাশা, পরচর্চ্চা, চুর্ণ রাজনীতি আর ক্ষণস্থায়ী সুখের কারণে জীবনপাত করলে, হতভাগ্য কাঠুরের সঙ্গে আমাদের তফাৎটা রইল কোথায়? খাদ্য সংগ্রহ, নারী সংগ্রহ পশুদের আয়ত্বের মধ্যে। অর্থ সংগ্রহ, খ্যাতি সংগ্রহ খুব নিকৃষ্ট মানুষেরাও পারেন। এর সবই মিথ্যা। এই জগত, এই দেহ সবই মিথ্যে। শুধু মিথ্যে কথা বলে কিছু জমি লাভ, অর্থ লাভ হলে নিজেকে বেশ বুদ্ধিমান মনে করি। বেশ যোগ্যতাসম্পন্ন মনে হয় নিজেকে। কিন্তু এ চিন্তার উৎস মিথ্যে অহং। মিথ্যে দিয়ে মিথ্যে বস্তু সংগ্রহে

আর যোগ্যতা কোথায়? এই মিথ্যে দেহ, মন, বুদ্ধি দিয়ে যদি সত্যবস্তু অর্থাৎ ঈশ্বর সংগ্রহ করতে পারতাম, সেটা হতো যোগ্যতা। তাই এদেশে সকলকে যোগ করতে বলা হয়। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ অর্থাৎ দিনে দিনে নিজেকে যোগ্য করা। তবেই তো ধরা দেবেন যোগেশ্বর। অন্যান্য দেশে আছে "বাদ"। ধনতন্ত্রবাদ, গণতন্ত্র সমাজবাদ, মার্কসবাদ সহস্র রকমের বাদ। এই সহস্র বাদের বাদানুবাদে জীবন আবাদ হয়-না, বরবাদ হয়।

এই বরবাদ হয়ে যাওয়া জীবনগুলো আমরা আমাদের চর্তুদিকে দিনরাত দেখতে পাই। এদেশে কোটি-কোটি কৃষ্ণভক্ত আছেন। নিষ্ঠা সহকারে নাকে রসকলি আঁকেন, শ্রীচৈতন্য রাখেন, অহোরাত্র শ্রীকৃষ্ণের নামোচ্চারণ করেন। কিন্তু তাদের জীবন শ্রীকৃষ্ণের ধারে কাছে নেই। কৃসণ ছিলেন অসাধারণ যোদ্ধা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন ঝানু রাজনীতিবিদ, কিন্তু নির্বিকার, নিরাসক্ত, নির্লোভ আর তাঁর সমস্ত গুণাবলী নিবেদিত হয়েছিল রাষ্ট্রহিতায়। তাঁর গোটা জীবনে একটা কাজ নেই যা যুক্তিহীন, অলৌকীক, অতীন্দ্রীয়। অথচ এ দেশের অধিকাংশ কৃষ্ণভক্তের জীবন ভক্তিমার্গের এমন স্তরে যেখানে যুক্তির বিন্দুবিসর্গ নেই।

কুরুক্ষেত্রের প্রথম দৃশ্যটাই আলোচনা করা যাক। অর্জুন বললেন, সখা আমি যুদ্ধ করতে পারবো না, এই আত্মীয় হত্যা করে আমি রাজ্য চাই না। আমি দূর গ্রামে চলে গিয়ে ভিক্ষা করে খাবো, তুমি আমাকে যুদ্ধ করতে বলো না। আজকের ভারতের কোটি কোটি কৃষ্ণভক্তের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী কৃষ্ণের কি বলা উচিত ছিল? বলা উচিত ছিল, সখা অর্জুন তোমার মধ্যে যথার্থ বৈরাগ্যের উদয় হয়েছে। এই নাও গেরুয়া আর এই নাও খঞ্জনী, চলে যাও দূর গ্রামে, অহোরাত্র কীর্তন করে পাড়ার লোককে বিনিদ্র করে রেখে দাও আর ভিক্ষান্নে জীবিকানির্বাহ কর।

শ্রীকৃষ্ণ বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন, তাই এসব না বলে তিনি বললেন, ক্লীব, নপুংসক কোথাকার। ক্ষত্রিয় পুত্র তুমি, যুদ্ধ করবে না মানে? ক্লৈব্যংমাস্মঃ গমঃ পার্থের সহজ বাংলা এই রকমই দাঁড়ায়। অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করালেন তিনি। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান হয়েও পায়ে হেঁটে ঘুরেছেন সারা ভারতবর্ষ। উদ্দেশ্য রাজন্যবর্গকে পাণ্ডব পক্ষে যুক্ত করা। তিনি তো ইচ্ছে করলেই সব শত্রু নিপাত করতে পারতেন।

প্রচলিত ধর্মাচরণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিত আচরণগুলি মিলিয়ে দিলেই বোঝা যায় সারা দেশ এক অদ্ভুত আচরণে অভ্যস্ত হয়েছে ধর্মের নামে। শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছা করলেই অর্জুনকে যোদ্ধা না করে ভালো কীর্তনীয়া করতে পারতেন। বলতে পারতেন অর্জুন,

যুদ্ধবিদ্যা শেখার কোন দরকার নেই। আমার আগে রামচন্দ্র এসেছিলেন, তাঁর নামে জলে শিলা ভেসেছিল, তুমিও শুধু নাম কর। নামেই সব হবে। নামে সব হয় না কৃষ্ণ জানতেন। তাই তিনি কখনো বলেননি কিছু করার দরকার নেই, শুধু নাম কর। আঠারো দিন ধরে যুদ্ধ করার দরকার নেই। আঠারো দিন ব্যাপী কীর্তন কর, তারপর মোচ্ছব। আজকের কৃষ্ণভক্তির প্রকাশ তো এভাবেই হচ্ছে। প্রতিদিন যুদ্ধ হয়েছে মহাপরাক্রমশালী বীরদের সঙ্গে। ধরা যাক দ্রোণাচার্য্যের সঙ্গে যুদ্ধ হবে। আজকের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণের বলা উচিত ছিল, অর্জুন, আজ তোমার গুরুদেবের সঙ্গে যুদ্ধ, তুমি এক কাজ কর, ভালো করে আজ একটা শনিপূজা কর কিংবা সন্তোষীমায়ের, তারপর যুদ্ধ কর। ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধের আগে বলতে পারতেন, আজকের যুদ্ধ মহাপরাক্রমী ভীষ্মের সঙ্গে। আজকে রূপোর পাতে মোড়া একটা আমড়ার আঁটি ধারণ করে যাও। অথবা ঘোড়ার খুর কিংবা অনন্তমূল ধারণ কর, এসব বলেননি।

কারণ কৃষ্ণ প্র্যাকটিক্যাল ছিলেন। তিনি ভীষ্মের দুর্বলতা অনুসন্ধান করে শিখণ্ডীকে সামনে খাড়া করে ভীষ্মকে বধ করলেন, কোন অলৌকিকতার আশ্রয় নেননি। ধর্ম যখন প্র্যাকটিক্যাল ছিল এই দেশে তখন দলে দলে বীর, যোদ্ধা, সাহসী, সৎ, সরল মানুষ তৈরী হয়েছে। আজ ইমপ্র্যাকটিক্যাল ধর্মচর্চা হচ্ছে তাই কাপুরুষ, ভীরু, স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রীক, দুর্নীতিপরায়ণ মানুষ আজ খুঁজতে হয় না। নিজের বুকে হাত দিলেই এইসব মানুষের দেখা পাওয়া যায়।

আজকে দেশে ঈশ্বর বিশ্বাস বলে যা দেখা যাচ্ছে তা মোটেই বিশ্বাস নয়। প্রত্যেকটি ভক্ত একযোগে অসংখ্য বস্তুতে বিশ্বাস করে। ইষ্ট থেকে সুরু করে গোমেদ, পলা, অনন্তমূল, ঘোড়ার খুর পর্য্যন্ত। বিশ্বাস খণ্ড খণ্ড মানেই অবিশ্বাস, সন্দেহ। বিশ্বাস হবে একাগ্র পিন পয়েন্ট, সূচীমুখ। তা আজ আর কোথাও নেই। তাই ধর্মের নামে দিনরাত তুষে পাড় দেওয়া চলছে। ঈশ্বর সম্পর্কে সবাই মিলে ধারণা গড়ে তুলছেন ঈশ্বর দুঃখহরণকারী। ঈশ্বরকে দুঃখবরণকারীরূপে মেনে নেবার শিক্ষা কেউ দিচ্ছেন না। শ্রীকৃষ্ণের সবচেয়ে প্রিয় পাত্র-পাত্রী ছিলেন পাণ্ডবেরা। তারমধ্যে আবার অর্জুন-দ্রৌপদী।

এদের সারা জীবন কেটেছে ছন্নছাড়া হয়ে বনবাসে, অজ্ঞাতবাসে, সংঘাতে, সংঘর্ষে। পুত্রশোক হয়েছে, অভিমন্যুকে দাহ করা হচ্ছে, দাহ শেষ হতেই অর্জুনকে বললেন শ্রীকৃষ্ণ ঃ চলো, ওঠো, যুদ্ধ করো। তারপরে মহাপ্রস্থানের পথে একে একে ঠাণ্ডায়

মৃত্যুবরণ। আজকের কৃষ্ণভক্তদের কাছে যদি বলা হয়, পাণ্ডবদের জীবনের দুঃখ, যন্ত্রণা, যুদ্ধ, পুত্রশোক মেনে নিলে তবে কৃষ্ণের প্রিয় হওয়া সম্ভব, কে রাজী আছেন? আমি সন্দেহ পোষণ করি, একজনকেও পাওয়া যাবে কি না। কারণ আজকের ধর্ম যুক্তির চেয়ে আবেগকে, বাস্তবতার অপেক্ষা অলৌকিকতাকে, পরিশ্রমের চেয়ে কৌশলকে গুরুত্ব দিয়েছে বেশী। কৌশল করে একটা ব্যবসা কিছুদিন চলতে পারে, একটা দুটো নির্বাচনেও জেতা যেতে পারে। কিন্তু জীবন যুদ্ধে জেতা যায় না। নিজেকে জয় করা তো আরো অসম্ভব। ভাবের ঘরে চুরি করা একটা চুর্ণ ভঙ্গুর মানুষ তৈরী হয়। সে সামান্য বিপদেই অসহায় হয়ে যায়। কারণ অবাস্তব কল্পনার জগতে এরা বাস করে ভাবে প্রত্যেকটি ছোটখাটো বিপদে ঈশ্বর এসে তাকে উদ্ধার করবে। ধর্ম মোটেই কল্পনার নয়। একটি নিতান্ত বস্তুনিষ্ঠ বিষয়। এটা আজকের সমাজের ধর্মাচরণকারীদের বোঝা দরকার। যা জগতকে ধারণ করে রাখবে, সেই ধর্ম কি ইন্দ্রিয়াতীত, কল্পনাময় অবাস্তব অলৌকিক হতে পারে? হতে পারে না, হলে জগৎ দাঁড়াবে কোথায়? ধ্বংস হয়ে যাবে। ধর্ম, ঈশ্বর কল্পনার বস্তু নয়, একটি অতি বাস্তব জিনিস। শ্রীকৃষ্ণের গোটা জীবন, গীতার প্রত্যেকটি লাইন তার প্রমাণ। একটি অযৌক্তিক ঘটনা নেই, একটি অলৌকিক লাইন নেই। আমাদের জীবনটাকে তাই করতে হবে। কৃষ্ণের ভাবে নয়, কৃষ্ণের আচরণে অভ্যস্ত হতে হবে। কৃষ্ণভক্তি নয়, কৃষ্ণশক্তি অর্জন করতে হবে। সেটা যে রসকলিতে নয়, কীর্তনে নয়, তার ঘোষণা কৃষ্ণ স্বমুখে করে গেছেন, যেখানে ধনুর্দ্ধারী পার্থ, সেখানেই যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ থাকেন। সুবল, শ্রীদাম কিংবা ভালো কীর্তনীয়াদের কাছে নয়। এই নিষ্ঠুর সত্যের বাস্তব কষ্টিপাথরে ধর্মের মূল্যায়ণের দিন এসেছে।

আমাদের দেশে প্রত্যেকটি অবতার, মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করে তাঁদের অবতারত্ব কিংবা মহাপুরুষত্ব নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তাঁদের গুণাবলী এবং যোগ্যতার প্রয়োগক্ষেত্র ছিল সমাজ, রাষ্ট্র। চোখের সামনে ছিল বিপুলা পৃথিবী, পায়ের নীচে ছিল নিজদেশের মাটি। বাস্তব অবস্থাকে কেউ উপেক্ষা করেননি, অথচ তাঁরা ধর্মের সম্প্রসারণ ঘটিয়েছিলেন সারা বিশ্বে। চিন্তায় তাঁদের ছিল স্বচ্ছতা। সব ধর্মকে সমান বলে জটিলতা সৃষ্টি করে সনাতন ধর্মের আত্মবিলুপ্তির পথ প্রশস্ত করেননি। অসহিষ্ণু, পরধর্মবিদ্বেষী, সাম্রাজ্যবাদী মতবাদগুলিকে ধর্ম বলে ঘোষণা করে আজ জাতীয় জীবনে দুর্যোগ ডেকে আনা হয়েছে, তার ফলশ্রুতিরূপে আজ সারা দেশ বিপন্নতার মুখে।

কোনটা ধর্ম এবং কোনটা আমাদের ধর্মের শত্রু এ কথা ধার্মিক ব্যক্তিদের সাহসের সঙ্গে ঘোষণা করতে হবে।

আর এতো কষ্ট কল্পিত ঘোষণা নয় ফলিত ইতিহাস, ঘটিত বিষয়। যে কোন মুসলীম দেশের চরিত্র, আচরণ দেখলেই এ কথা বোঝা যায়। নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, ঝাড়খণ্ড আন্দোলনে বোঝা যায় খ্রীষ্টান চরিত্র। কোন দেশে, কোন রাজ্যে, কোন গ্রামে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি হলেই বাকী ধর্মের লোকরা আতঙ্কিত হয় কেন? ধর্ম সব সমান বলে? এদেশের পণ্ডিত, সাধু সন্ন্যাসীরা একটা কর্তব্য দীর্ঘদিন করেননি। দেশের মানুষকে কোরাণ, বাইবেল পড়তে উদ্‌বুদ্ধ করেননি। এই গ্রন্থগুলোয় প্রকৃতপক্ষে কি আছে তা বলেননি। কেউ ভয়ে, কেউ অজ্ঞতায়, কেউ ভাবের ঘোরে নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে কোরাণ, বাইবেলের ব্যাখ্যা করেছেন। অনুসন্ধিৎসা, বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে না পড়েই। এঁরা ভেবেছেন নাইবা পড়লাম কোরাণ। বেদ পড়েছি, উপনিষদ পড়েছি, গীতা পড়েছি, ওগুলো যখন ভালো তখন না পড়েও বলা যায় কোরাণ ভালোই হবে। এই জড়তা, আত্মঘাতী বুদ্ধি পরিত্যাগ করে প্রকৃত সত্যসন্ধানীর দৃষ্টি নিয়ে কোরাণ, বাইবেল পড়তে হবে। সেইসঙ্গে এই গ্রন্থগুলোর স্বরূপ বুঝতে সাহায্যকারী গ্রন্থ মহর্ষি দয়ানন্দ রচিত "সত্যার্থপ্রকাশ" পড়তে হবে। আমাদের সব পতনের কারণ আমরা সত্যে প্রতিষ্ঠিত নই।

সত্য প্রকাশে সাহসী নই। সত্য বর্জিত ধর্মের রূপটাই আমরা চারিদিপ দেখতে পাচ্ছি। এতে দুঃখের হতাশার কিছু নেই কারণ, এইদেশে এখনও বিপুল প্রাণশক্তি বিদ্যমান। ধর্ম ভাবনা ঠিক হোক ভুল হোক এখনও কোটি কোটি মানুষ ধর্মাভাবে প্রভাবিত। মানুষ সংক্রামক প্রাণী। সঠিক ব্যক্তিরা সংক্রামিত করতে পারলে সমাজ স্বাভাবিক হওয়া কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়। একথাও আমরা সবাই জানি, মণ মণ দুধকে দই করতে গেলে মণ মণ সাজা বা দম্বলের দরকার হয় না। সামান্য ধার্মিক মানুষ, সত্যনিষ্ঠ সাহসী মানুষ, যাদের ব্যক্তি চরিত্র জাতীয় চরিত্র এবং পরমেষ্টি চরিত্র আছে, তাঁরা একটু সচেতন হয়ে পরিবেশকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করলেই সারা দেশ পরিবর্তিত হয়ে যাবে। দেশের প্রতিটি মানুষ এই শ্বাসরোধকারী জাতীয় অবস্থা, কুৎসিত সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তন চাইছেন। কিন্তু কঠিন, কঠোর সত্যটি হচ্ছে এই, যিনি সমাজের পরিবর্তন চাইবেন তাকে নিজের মধ্যে পরিবর্তন আগে আনতে হবে। এটাই সব আদর্শ, ধর্মবোধ ও সমাজ পরিবর্তনের গোড়ার কথা এবং শেষ কথা।

— — —
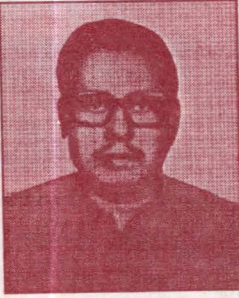
শিবপ্রসাদ রায় (১৯৩৭-১৯৯৯)

লেখক পরিচিতি

শিবপ্রসাদ রায়-এর জন্ম ১৯৩৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার ছোট্ট শহর কালনায়। শৈশবেই তিনি পিতৃহারা হন। বাল্যকাল কেটেছে অত্যন্ত দারিদ্রের মধ্যে। স্কুল কলেজের প্রথাগত শিক্ষা যা বাঙালি মধ্যবিত্ত ঘরের ছাত্রছাত্রীরা সাধারণতঃ পেয়ে থাকে দারিদ্রের কারণে সেটা থেকেও তিনি বঞ্চিত হন। তাঁর শিক্ষাদীক্ষা একরকম স্বোপার্জিত বলা চলে। শিক্ষার প্রতি তাঁর অদম্য আগ্রহ তাঁকে নিরুৎসাহিত করতে পারেনি। ম্যাক্সিম গোর্কির মতই শিবপ্রসাদ রায় কঠিন, নির্দয়, বাস্তবজীবন থেকেই তাঁর শিক্ষার রসদ সংগ্রহ করেছেন।

হিন্দু সমাজের বর্তমান দুর্ভাগ্যজনক অবস্থায় তিনি ব্যথিত, বিষাদ ক্লিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। বয়ঃসন্ধিকাল থেকেই তিনি হিন্দু জাগরণের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি অকৃতদার ছিলেন। প্রবন্ধ রচনা, পুস্তক, পুস্তিকা প্রকাশনা, জনসভায় বক্তব্য রাখা ছাড়াও হিন্দু সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তিনি বিশ্বহিন্দু পরিষদ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ প্রভৃতি হিন্দু সংগঠনগুলির সঙ্গে আজীবন যুক্ত ছিলেন। তাঁর পুস্তক-পুস্তিকাগুলি ইংরেজি, হিন্দি, তামিল, মারাঠি, গুজরাটি প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হয়ে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। তাঁর রচনাগুলি ছিল অত্যন্ত সবল, সহজবোধ্য এবং মর্মস্পর্শী ও অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠ।

হিন্দু সমাজের সচেতনতা বৃদ্ধিতে তাঁর অবদান অনবদ্য। তাঁর আদর্শবাদ, সমকালীন ঘটনাবলী সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তাঁর নিবন্ধ এবং বক্তব্য ভারতের হিন্দুদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর শাসনকালে 'আপৎকালীন' সময়ে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। ফলে তিনি জনগণের আরও প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। ১৯৯৯ সালে মাত্র ৬২ বছর বয়সে 'সেরিব্রাল এ্যাটাকে' তিনি আক্রান্ত হন এবং তাঁর জীবনাবসান হয়।